LOVE FOR ALL
HATRED FOR NONE
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্
পাক্ষিক
আহ্‌মদী
নব পর্যায় ৬৯ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
১৬ ভাদ্র, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ ৬ শাবান, ১৪২৭ হিজরি
৩১ আগস্ট, ২০০৬ ঈসাব্দ

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘন্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এরূপ সত্য কথা যে, কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমনকি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তিকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তিকাফ যে-

ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;

খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ্ করতে পারেন এবং

গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারী পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাদের মাঝে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোজা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড় পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগত বলবে ভুল-আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি একথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, অথচ খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি এটা বিশ্বাস করেন, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয়নি সে আদৌ পরিশ্রম করেনি।

আপনি যদি এরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মুবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করেছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে এটি পুনরায় সজীব হবে।

সম্পাদকীয়

আঁ হযরত (সঃ)-এর সত্যতা ও বিশ্বস্ততা

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ)-এর সততা ও বিশ্বস্ততার প্রতি লক্ষ্য করুন। আরবে সকল অন্যায় অনাচার তিনি (সঃ) সহ্য করেছেন, নানা প্রকার পাহাড়সম বিপদাপদের মধ্য দিয়েও তিনি খোদাতাআলার দিকে সকলকে আহ্বান করেছেন। মাঝে বাঁধাবিপত্তি ছিল, কিন্তু কোন পরওয়া করেননি। এরূপ ছিল তাঁর বিশ্বস্ততা, যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্তাআলা তাঁর উপর করুণা বর্ষণ করেছেন। এ কারণেই আল্লাহ্তাআলা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেনঃ-

নিশ্চয় আল্লাহ্ এই নবীর উপর রহমত নাযেল করেছেন এবং তাঁর ফিরিশ্তাগণও তাঁর জন্য রহমত কামনা করেছে। হে যারা ঈমান এনেছ, তোমরাও তাঁর জন্য রহমত কামনা (দরূদ পাঠ) কর এবং পূর্ণ শান্তি কামনা কর (৩৩ঃ৫৭)।

তাঁর জীবনে সততাও বিশ্বস্ততার বহু ঘটনা ঘটেছে, নিম্নে সংক্ষেপে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

একবার রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি বন্দী হয়ে এলো। সে বহু মুসলমানকে হত্যা করেছিল। হযরত ওমর (রাঃ) মনে করেছিলেন যে, এই ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডের যোগ্য। তিনি বার বার রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দিকে তাকাচ্ছিলেন, যেন ইশারা পাওয়া মাত্রই লোকটাকে হত্যা করতে পারেন। লোকটা যখন উঠে চলে গেল, তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, 'ইয়া রসূলুল্লাহ্! এই লোকটা তো হত্যার যোগ্য ছিল। আঁ হুযূর (সঃ) বললেন, হত্যাযোগ্য ছিল তো, তুমি তাকে হত্যা করলে না কেন? তিনি (রাঃ) বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্, আপনি যদি একটু শুধু চক্ষের ইশারা করতেন, আমি ওকে কতল করতাম। আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'নবী তো ধোঁকাবাজ হয় না। এটা কী করে হতে পারে যে, আমি মুখে তার সঙ্গে স্নেহ-মমতার কথা বলবো আর চোখে তাকে হত্যা করার ইশারা করবো।" (ইবনে হিশাম)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ

আঁ হযরত (সঃ)-এর আত্মায় ঐ সততাও বিশ্বস্ততা ছিল এবং তাঁর (সঃ) আমল খোদার দৃষ্টিতে এরূপ পছন্দনীয় ছিল যে, আল্লাহ্তাআলা সর্বক্ষণ ও চিরকালের জন্য এই আদেশ দিয়ে রেখেছেন যে, ভবিষ্যতে মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ধারায় (তাঁর -সঃ) ওপর দরূদ প্রেরণ করবে। তাঁর (সঃ) অসীম সাহস ও সততা এরূপ ছিল যে, যদি আমার ওপরে বা নীচের দিকে তাকাই তাহলেও তাঁর দৃষ্টান্ত মিলবে না। মসীহ্ (আঃ) এ যুগের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাঁর (সঃ) অনুসারীদের ওপর তাঁর আধ্যাত্মিক সততা ও বিশ্বস্ততার কীরূপ প্রভাব পড়েছিল। প্রত্যেকেই এটা উপলব্ধি করতে পারবেন যে, একজন মন্দ স্বভাবের লোককে সংশোধন করাটা কত কঠিন। মজ্জাগত অভ্যাসকে দূর করা কিরূপ অসম্ভব ব্যপার। কিন্তু আমাদের পবিত্র নবী (সঃ) তো অগণিত মানুষকে সংশোধিত করেছেন যারা পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট ছিল। (মলফূযাত, প্রথম খন্ড)

আল্লাহ্ করুন, আমরা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) এর জীবনকে আমাদের জীবনে পরিণত করে নিতে পারি এবং আমরা যেন তাঁর ওপর অগণিত দরূদ কামনা করতে পারি আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে এ তৌফীক দান করুন।

আল্লাহুম্মা সাল্লে ওয়া সাল্লাম ওয়া বারেক আলাইহে ওয়া আলেহি ওয়া আসাবিহি আজমাইন।

৩১ আগস্ট, ২০০৬

সূচীপত্র

সূচীপত্র	পৃষ্ঠা নং
• কুরআন শরীফ	৪
• হাদীস শরীফ	৫
• অমৃতবাণী	৬
• জুমুআর খুতবা ঃআঁ হযরত (সঃ) স্বয়ং ইবাদতের মান প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং নিজের অনুসারীদের নসিহত করেছেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) *অনুবাদ-মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন*	৭-১৩
• জুমুআর খুতবা ঃ ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে সব রকম দুর্যোগের মোকাবেলা করা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) *অনুবাদ-আলহাজ্জ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান*	১৪-২০
• নবী করীম (সঃ) এর মাধ্যমে উম্মতে মুসলিমা প্রতিষ্ঠিত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) *অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্*	২১-২৪
• হুযূর (আইঃ)-এর সিঙ্গাপুর সফর *অনুদাবদ ঃ কওসার আলি মোল্লা*	২৫-২৭
• প্রফেসার আব্দুল লতিফ এক বড়ে বুযুর্গ থে *মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল*	২৮-৩০
• লেবাননে ইসরালের অন্যায় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিক্রিয়া ও সতর্কবাণী	৩১
• উকিল আ'লার দফতর থেকে *অনুবাদ ঃ বশির উদ্দিন আহমদ*	৩২
• আমি মুসলমান আমার ধর্ম ইসলাম *আলহাজ্ব এ.কে. রেজাউল করীম*	৩৩-৩৪
• ডেঙ্গু জ্বর *ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান*	৩৫
• মহান ত্যাগের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসার লাভ *হাসেম উল্লাহ্ সিকদার*	৩৬
• মুলাকাত *অনুবাদ ঃ মরহুম আলহাজ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী*	৩৭-৩৯
• সংবাদ	৪০-৪১

প্রচ্ছদ ঃ ইউ কে -এর ৪০তম জলসা সালানা ২০০৬-এ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ)

সৌজন্যে ঃ মারিয়া তাসাদ্দক

কুরআন শরীফ

সূরা ইউনুস-১০

৭। নিশ্চয় রাত ও দিনের আবর্তনে এবং আকাশসমূহ ও আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মাঝে মুত্তাকীদের জন্য অনেক নিদর্শন ১২৩৮ রয়েছে।

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ۝٧

৮। নিশ্চয় যারা আমাদের সাক্ষাতের আশা ১২৩৯ রাখে না আর পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট আর এতেই পরিতৃপ্ত এবং যারা আমাদের নিদর্শনাবলীর প্রতি উদাসীন,

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيٰتِنَا غٰفِلُونَ ۝٨

৯। এদের অর্জিত কর্মফলের দরুন আগুন হলো ঠাঁই।

أُولٰٓئِكَ مَأْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝٩

১০। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদের প্রভু-প্রতিপালক তাদের ঈমানের দরুনই তাদেরকে হেদায়াত দান করবেন। (এবং) নেয়ামতপূর্ণ বাগানসমূহে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ১৪০ নদ-নদী বয়ে যাবে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمٰنِهِمْ ۚ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهٰرُ فِي جَنّٰتِ النَّعِيمِ ۝١٠

সূর্য এবং চন্দ্রের গতিবিধির উপর নির্ভর করে। চন্দ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, ফলে আমরা মাস পঞ্জির হিসেব জানতে পারি। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে এবং নিজ অক্ষরেখার উপরেও আবর্তন করে, এরূপে আমাদেরকে বছর এবং দিন নিরূপন করতে সক্ষম করে।

১২৩৮। বর্তমান আয়াতে 'মুত্তাকীদের জন্য' উক্তিটি পূর্ববর্তী আয়াতের 'জ্ঞানী লোকদের জন্য' বদলে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ যদিও চন্দ্র-সূর্যের ক্রম-আবর্তন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়-সাধারণ ব্যক্তিও তা জানে, তবুও শুধু মুত্তাকী লোকেরাই বিরূপভাবে না নিয়ে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা থেকে প্রকৃত আধ্যাত্মিক ফায়দা হাসিল করতে পারে। উক্ত আয়াতে বর্ণিত চন্দ্র এবং সূর্যের ভিন্ন ভিন্ন কক্ষ বিন্যাস সকলের অনুধাবন করা এবং বোধগম্য হওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। অতএব জ্ঞান-সমৃদ্ধ ব্যক্তিরাই তদ্বারা উপকৃত হতে পারে। এছাড়া দিন এবং রাত্রির পরিবর্তন জাতিসমূহের উত্থান-পতনের অনুরূপ। তাদের উন্নতি এবং গৌরবময় দিবসের পরে আসে তাদের অবনতি ও অধঃপতনের রাত্রি। কোন জাতি কখনও অবিরাম বা স্থায়ী গৌরব ভোগ করেনি, কোন জনগোষ্ঠীও চিরকাল দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকে না বা চিরদিন অধঃপতিত অবস্থায় অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়ায়নি। কোন জাতি তাদের উন্নতিকালকে দীর্ঘায়িত করতে পারে এবং অবনতি ও অবক্ষয়ের অন্ধকার রাত্রিকে হ্রাস করতে পারে। তাদের রাত্রির আগমনকে বিলম্বিত করাও তাদের কর্মফল দ্বারাই সম্ভব।

১২৩৯। মানব প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে এ গুরুত্ববহ বাস্তব সত্য উদঘাটিত হয় যে, মানবীয় সকল উন্নতি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি আশা ও ভয়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের চরম প্রচেষ্টা এ দু'টির যে কোন সহজাত বৃত্তির প্রেরণা-প্রসূত। কেউ কেউ ক্ষমতা, পদ বা সম্পদ বৃদ্ধির আশায় অনুপ্রাণিত হয়ে কঠোর পরিশ্রম করে, অন্যান্যরা ভীতির কারণে কাজ করে। বর্তমান আয়াত উল্লেখিত উভয় শ্রেণীর লোকের হৃদয়ে নাড়া দেয়া হয়েছে 'রাযা' শব্দ ব্যবহারে, যার অর্থ সে আশা করেছিল, সে ভীত হয়েছিল (লেইন)।

১২৪০। 'তাহ্‌ত' (পাদদেশ) শব্দ এখানে বশ্যতা বা দাসত্ব অর্থে আলঙ্কারিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থে 'তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন' উক্তির মর্ম হলো, জান্নাতের অধিবাসীরা তাদের পাদদেশে প্রবাহিত ঝর্ণাধারা, দখলদাররূপে বা প্রজাস্বত্বরূপে ভোগ করবে না, বরং তারা জান্নাতের উক্ত স্রোতাস্বিনীর মালিক এবং পরিচালকও হবে।

হাদীস শরীফ

হাদীস শোনাও এবং শুন

কুরআন ঃ

আরবী হবে

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝٦٨

অর্থাৎ ঃ হে রসূল! তোমার প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তা তুমি সবার নিকট পৌঁছিয়ে দাও, এবং যদি তুমি এইরূপ না কর তাহলে তুমি তাঁর পয়গাম পৌঁছাওনি। (সূরা মায়েদা ঃ ৬৮)

হাদীস ঃ

অর্থাৎ হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌তাআলা তাকে (আধ্যাত্মিক) সজীবতা দান করুন, যে আমার নিকট থেকে হাদীস শোনে এবং তা মনে রাখে এমনকি অন্য আরেক ব্যক্তির নিকটও পৌঁছায়। অনেক সময় এমন হয়ে থাকে যে, সে হাদীসটি তার থেকে অধিক বুদ্ধিমান জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট পৌঁছিয়ে দেয় এবং অনেক সময় এমনও হয়ে থাক যে, সে হাদীস শুনে মনে রাখা ব্যক্তিটি সেই হাদীসটিকে বুঝাতেও পারে না।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসটিতে হযরত রসূল করীম (সঃ) তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণীর গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদিগকে অবগত করেছেন। পবিত্র কুরআন হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর মুখ নিঃসৃত কালামের ব্যাপারে বলে যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যা কিছু বলেন ওহী প্রাপ্ত হয়েই বলে থাকেন। কুরআনের এই বাণী দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর কথার মূল্য কত বড়। তাই তো রসূল করীম (সঃ) সেই ব্যক্তির জন্য দোয়া করেছেন, যে হাদীস শোনে মনে রাখে ও অন্য ব্যক্তির নিকটও তা পৌঁছায়। বস্তুতপক্ষে হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত খোদাতাআলার একত্ববাদ প্রচারে ব্যয় হয়েছে, প্রতিটি কথা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পাথেয়। তাঁর বাণী জীবনের মধ্যে এনে দিতে পারে এক আমূল পরিবর্তন, জীবনের গতিধারাকে ঘুরিয়ে দিতে পারে অন্য ঐশী জগতের বিচরণ ভূমির দিকে। তাই আমাদের কর্তব্য, হাদীস রসূল আরবী (সঃ) আমরা নিজেরা যেন পড়ি এবং পরিবারবর্গকে পড়াই এবং অন্যকেও এদিকে উদ্বুদ্ধ করি। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সবাইকে এ তৌফিক দান করুন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা– মাওলানা সালেহ্ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

নেযামে খেলাফতের চিরস্থায়ী প্রয়োজনীয়তা ও উহার গুরুত্ব

"স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে খলীফা বলে এবং রসূলের স্থালাভিষিক্ত প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তিই হতে পারেন যার মধ্যে যিল্লিভাবে অর্থাৎ প্রতিবিম্বাকারে রসূলের কামালিয়ত সমূহ বিদ্যমান থাকে। এইজন্য রসূর করীম (সঃ) অত্যাচারী বাদশাহের ক্ষেত্রে খলীফা শব্দের প্রয়োগ করা পছন্দ করেননি। কেননা খলীফা প্রকৃতপক্ষে রসূলের যিল্ বা প্রতিবিম্ব হয়ে থাকেন।

বস্তুতঃ খলীফা রসূলের যিল্ বা প্রতিবিম্ব ঃ

যেহেতু কোন মানুষকে চিরস্থায়ী জীবন দেয়া হয় না, সেই জন্য খোদাতাআলা ইচ্ছা করেছেন যে নবীগণের সত্ত্বাকে –যা পৃথিবীর সকল সত্ত্বা অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদাশীল এবং সর্বোত্তম–কেয়ামত পর্যন্ত সর্বদা প্রতিবিম্ব স্বরূপ কায়েম রাখবেন। এ উদ্দেশ্যে খোদাতাআলা খেলাফতের ব্যবস্থা করেছেন যেন দুনিয়া কখনো এবং কোন যুগে রেসালতের বরকত হতে বঞ্চিত না হয়।

সুতরা যে ব্যক্তি খেলাফতকে শুধু মাত্র ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ বলে মনে করে সে নিজ অজ্ঞতাবশতঃ খেলাফতের মুখ্য উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে এবং সে জানে না, খোদাতাআলার এ ইচ্ছা কখনই ছিল না যে রসূল করীম (সঃ)-এর ওফাতের পর ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত খলীফাগণের ভূষণে রেসালতের বরকত সমূহ কায়েম রাখা জরুরী ছিল এবং তারপর দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যায় তো যাক কোন পরওয়া নেই। (শাহাদাতুল কুরআন, পৃঃ ৫৮)

মালী কুরবানীর গুরুত্ব

"যে ব্যক্তি এসকল জরুরী মহাকার্যাবলীতে অর্থ দান করবে আমি আশা করি না যে তার এরূপ অর্থদানে তার সম্পদে কোন অভাব ঘটতে পারে, বরং তার মালে বরকত দান করা হবে। সুতরাং আপনাদের উচিত, খোদাতাআলার উপর তওক্কল (নির্ভর) করে পূর্ণ এখলাস, জোশ ও মহব্বতের সাথে মালী কুরবানীতে তৎপর হউন। এখন খেদমত করার সময়। তারপর এরূপ সময় আসছে যখন একটি স্বর্ণের পাহাড়ও এ পথে খরচ করলে তা বর্তমান সময়ের একটি পয়সারও সমান হবে না। এখন এরূপ এক সময়, যখন তোমাদের মধ্যে খোদাতাআলার সে প্রেরিত মহাপুরুষ বিদ্যমান, যে মহাপুরুষের আগমনের জন্য শত শত বৎসর ধরে উম্মতগণ অপেক্ষমান ছিল; যখন প্রতিদিন খোদাতাআলার পক্ষ হতে অসংখ্য ঐশী-সংবাদ ও নিদর্শন বহু ওহী-ইলহাম অবতীর্ণ হয়ে চলেছে এবং খোদাতাআলার ক্রমাগত নিদর্শনাবলীর সাহায্যে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে একমাত্র সে ব্যক্তিই এ জামাতের অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত হবে যে তার প্রিয় মাল এ পথে খরচ করে।"
(ইশতেহার তবলীগে রেসালত)

আঁ হযরত (সঃ) স্বয়ং ইবাদতের মান প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং নিজের অনুসারীদের নসিহত করেছেন

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) কর্তৃক ১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০০৬ইং তারিখে মসজিদ বায়তুল ফুতূহ লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা মোজাম্মেল এর ৭নং আয়াত তেলাওয়াত করে খুতবা প্রদান করেন।

إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝

অর্থাৎ নিশ্চয় রাত্রিকালিন উত্থান আত্মশুদ্ধির জন্য সর্বাধিক কঠিনপন্থা এবং বাক্যালাপে সর্বাধিক দৃঢ়তা দানকারী।

এটা সেই কুরআনী নির্দেশ যা হযরত (সঃ)-এর ওপর নাযেল হয় এবং তিনি দাবীর পূর্বেই এর হক আদায় করে দিয়েছেন, নবুওয়তের পূর্বেই তিনি এভাবে আল্লাহ্তাআলার খোঁজে এ'তেকাফ করতেন, নিজের রাতকে আরামে অথবা আনন্দে কাটানোর পরিবর্তে ইবাদতের মধ্যে কাটিয়ে দিতেন। রাতের ইবাদত যখন গভীর হয়, সবদিক নীরব হয়, বান্দা এবং খোদার মাঝে কোন রকমের বাঁধা থাকে না, সেই সময় যারা আল্লাহ্র ইবাদতকারী হয়, তারা অবশ্যই আল্লাহ্র নৈকট্য এবং তাঁর ভালবাসা অর্জনকারী হয়ে থাকে। কেননা, তারা শুধুমাত্র আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য এ ইবাদত করে থাকেন। এজন্যই তো আল্লাহ্তাআলা বলেছেন যে, এভাবে রাতে উঠা নিজের নফস্কে পায়ের নিচে পিষে ফেলার সমান। বরং এটা শয়তানকে ধ্বংস করার এবং নিজের নফস্কে কাবু করার এমন এক অস্ত্র, যার মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। সেই সময়ের প্রতিজ্ঞা তা এত পাকা শক্ত হয়ে থাকে যে, সেগুলোকে ভাঙ্গা সম্ভব নয়। শয়তানের সংস্পর্শ সেখানে থাকতেই পারে না। বরং আল্লাহ্তাআলার বান্দা হওয়ার জন্য এবং নিজের নফস্কে ধ্বংস করার জন্য রাতে উঠে ইবাদত করাথেকে উত্তম কোন মাধ্যম নেই। আর এ ইবাদতের উন্নত মান আমাদের নবী করীম (সঃ) সবচেয়ে বেশি অর্জন করেন। আর তিনি (সঃ) এর পবিত্র শক্তির প্রভাবে সাহাবী এবং উম্মতের মধ্যেও রাতে উঠে ইবাদতকারী সৃষ্টি হয়।

যে সূরার আয়াত আমি পড়েছি সেই সূরার শেষে আল্লাহ্তাআলা সত্যায়ন করেছেন যে, অবশ্যই আল্লাহ্তাআলা জানেন রাতের দুই তৃতীয়াংশে অথবা অর্ধেক অংশে অথবা সময় অনুযায়ী রাতের তৃতীয়াংশে, তুমি ইবাদতের উন্নত মান কায়েম করেছ, হক আদায় করে দিয়েছ, এজন্য আল্লাহ্তাআলা এর সাক্ষ্য দিচ্ছেন এবং তাদেরও সাক্ষ্য দিচ্ছেন যারা তিনি (সঃ)-এর অনুসরণ করবেন। সেইসব নির্দেশের উপর আমল করার জন্য যারা উদ্গ্রীব থাকবেন। তো এটাই হচ্ছে আল্লাহ্তাআলার সাক্ষ্য তাঁর প্রিয় রসূল (সঃ) এর বিষয়ে যে, হেদায়াত দেয়া হয়েছিল, ইবাদতের জন্য উঠ এবং অন্ধকার রাতের দোয়ার মাধ্যমে নিজেকে মজবুত করো। এবং নিজের উম্মতের জন্যও দূর্গ হয়ে যাও। এর ওপর পূর্ণ কায়েম হয়েছেন বরং উন্নত মান প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং হক আদায় করে দিয়েছেন। অন্য এক জায়গায় এভাবেও সাক্ষ্য পাওয়া যায় বলা হয়েছে (সূরা শো'আরা ২১৯-২২০) অর্থাৎ যিনি তোমাকে এখনও দেখেন। যখন তুমি দাঁড়িয়ে যাও। এবং সেজদাকারীদের মধ্যে তোমার অস্থিরতাকেও। সুতরাং যাকে আল্লাহ্তাআলা এই সনদ দিয়ে দিয়েছেন যে, সমস্ত সেজদাকারীদের মধ্যে তোমার মতো অস্থির সেজদাকারী আর কেউ নেই। যখন তুমি দাঁড়িয়ে যাও তো তোমার দাঁড়িয়ে যাওয়া ইবাদতের জন্য খোদতাআলার জন্য হয়ে থাকে, এবং যখন সেজদায় যাও তো সেটাও শুধুমাত্র খোদার জন্য হয়ে থাকে। তার সামনে ঝুঁকে যাওয়ার তার রহম অর্জন করার জন্য, নিজের জন্য এবং উম্মতের জন্যও। তো এমন ব্যক্তি সম্পর্কে কে বলতে পারে যে তিনি দুনিয়াবী আনন্দের লাভের চেষ্টায় ছিলেন, অথবা এমন হতে পারে। তার কোমল চেহারা দেখার জন্য তো মন পবিত্র হওয়া জরুরী, মনের কালিমা দূর করা জরুরী। ন্যায় বিচার করা জরুরী। খোদার ভয় জরুরী, মনের কালিমা দূর করা জরুরী, তাহলে সেই কোমল চেহারার সঙ্গে পরিচয় হতে পারে। এখন আমি এ বিষয়ে বলতে চাই, যে কাজের জন্য আল্লাহতাআলা তাকে নির্দেশ দিয়েছিল সেটা হচ্ছে আমার ইবাদত

কর এবং ইবাদতকারী বান্দা সৃষ্টি কর। শুধু কাজের উপরই তাঁর (সঃ)-এর আগ্রহ ছিল। এবং এ কাজের উন্নত মান কায়েম করার উপরে আল্লাহ্তাআলা সাক্ষ্য দিয়েছেন। বাস্তবতা এবং ঘটনাসমূহ ও ইতিহাসকে সামনে রেখে বলতে চাই যে, আঁ হযরত (সঃ) এর যদি কোন আগ্রহ ছিল, তাহলে তাঁর সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে ছিল, শুধু আগ্রহ ছিল না, বরং গভীর প্রেম ছিল। এমন প্রেম ছিল, যা অন্য কোন প্রেম কাহিনীতে পাওয়া সম্ভব নয়। যদি কোন আগ্রহ থাকে তাহলে এটাই যে, আমার শরীর, আমার প্রাণ, আমার আত্মা,আল্লাহ্তাআলার আস্তানায় পড়ে থাকবে। আর তার রাস্তায় কুরবানী হতে থাকবে। যৌবনেও স্ত্রীদের ব্যাপারে, আনন্দ স্ফুর্তির ব্যাপারেও অথবা খেলাধূলার ব্যাপারে তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। ঐ সময়েও এক খোদার সন্ধানে তার ভালবাসা, বাড়ীঘর ছেড়ে, স্ত্রী-সন্তান ছেড়ে কয়েকমাইল দূরে একটি গুহায় গিয়ে ইবাদত করতেন, যেন সেখানে গিয়ে কেউ ডিষ্টার্ব (Disturb) করতে না পারেন। কোন দুনিয়াদার ব্যক্তি, দুনিয়াবী বস্তুর আকৃষ্ট ব্যক্তি, জাগতিক জিনিসের প্রতি লোভী ব্যক্তি, এভাবে আমল করে থাকেন? আর এটা এমন একটি বিষয় যে, বিরুদ্ধবাদীরাও তাদের পুস্তকে এটা অস্বীকার করতে পারেনি, এর ফলাফল আর যাই হোক না কেন বাস্তবতাকে অস্বীকার করা সম্ভবপর নয়।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন–আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নীরব নিঃসঙ্গতা পছন্দ করতেন। তিনি ইবাদত করার জন্য অনেক দূরে হেরা পর্বতের গুহায় চলে যেতেন। এই গুহা এত ভয়ংকর ছিল যে, কোন মানুষ এর মধ্যে প্রবেশ করার সাহস পেত না। কিন্তু তিনি এটাকে এজন্য পছন্দ করেছিলেন যে ভয়ে কেউ সেখানে প্রবেশ করবে না। তিনি একেবারে একাকীত্ব চাইতেন। আত্মপ্রচার তিনি পছন্দ করতেন না। কিন্তু খোদাতাআলার পক্ষ থেকে নির্দেশ আসে (সুরা মুদাসসের ২-৩) ঐ নির্দেশের মধ্যে এক জোড়ালো ইশারা পাওয়া যায় এজন্যই বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয় যে, আপনার নীরব নিঃসঙ্গতা পছন্দনী ছিল তা ছেড়ে দিন। (মলফূযাত চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৪, নতুন সংস্করণ)

তো এত নির্জনতা ছেড়ে দুনিয়ার সামনে আসা এবং প্রিয় প্রভূর পয়গাম দুনিয়াতে পৌঁছানো, এটাও এজন্য করা হয়েছিল যে, নির্দেশ এসেছিল এটা কর। তাঁর নিজের কোন ইচ্ছাকে পূর্ণ করার ছিল না।

বাস্তবতা এবং ঘটনাসমূহ ও ইতিহাসকে সামনে রেখে বলতে চাই যে, আঁ হযরত (সঃ) এর যদি কোন আগ্রহ ছিল, তাহলে তাঁর সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে ছিল, শুধু আগ্রহ ছিল না, বরং গভীর প্রেম ছিল। এমন প্রেম ছিল, যা অন্য কোন প্রেম কাহিনীতে পাওয়া সম্ভব নয়। যদি কোন আগ্রহ থাকে তাহলে এটাই যে, আমার শরীর, আমার প্রাণ, আমার আত্মা,আল্লাহ্তাআলার আস্তানায় পড়ে থাকবে। আর তার রাস্তায় কুরবানী হতে থাকবে।

এক বর্ণনায় হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বর্ণনা করেন " হুযূর (সঃ) নবূওয়তের পূর্বে কিছু খাদ্যদ্রব্য এবং বিছানা পত্রসহ হেরা পর্বতের গুহায় গিয়ে এতেকাফের মাধ্যমে ইবাদত করতেন। সেখানে তিনি রাতের পর রাত ইবাদতের মধ্যে কাটাতেন এবং যখন খাদ্যসামগ্রী শেষ হয়ে আসতো তখন তিনি খাদিজা (রাঃ) এর কাছে এসে আরও খাদ্য সামগ্রী নিয়ে নিতেন এবং নির্জনে গিয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ করতেন। (বুখারী কিতাব বাদায়ুন ওহী)

এই আমল দিনের পর দিন চলতে থাকলো। সব সময় এই চিন্তা এবং চেষ্টা হতো যে, কিভাবে প্রিয় মাহবুব আল্লাহ্র সঙ্গে অন্তরের কথা বলা যায়। যেভাবে বলা হয়েছে যে তিনি আল্লাহতাআলার নির্দেশে কাবা শরীফে তবলীগ শুরু করেন। সেখানে গিয়ে নিজের নিয়মে ইবাদত করাকে মক্কার কাফেররা ভাল চোখে দেখতেন না। তারা তাঁকে ইবাদত করা থেকে বিরত রাখার জন্য নানা রকম বাহানা এবং চেষ্টা করতেন। কিন্তু যে ব্যক্তির সাথে এক খোদার প্রেম ছিল তা বাধা-বিপত্তি এবং বিরোধিতার কারণে শেষ হতে পারে না। সে সব বিরোধিতার মধ্যে থেকে একটি ঘটনা এভাবে এসেছে–

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন "নবী করীম (সঃ) বায়তুল্লাহ্ এর নিকট নামায পড়ছিলেন, সে সময় আবু জাহেল দলবলসহ সেখানে বসে ছিলেন। তাদের মধ্য থেকে একজন বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে যিনি অমুক লোকের উটের নাড়ি-ভুঁড়ি নিয়ে আসবে এবং মুহাম্মদ (সঃ) যখন সিজদায় যাবে তখন তাঁর পিঠে রাখবে। সুতরাং তাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি উঠলো এবং উটের নাড়ি-ভুঁড়ি নিয়ে আসলো এবং সে ঐ সময়ের অপেক্ষা করতে থাকলো যে, মুহাম্মদ (সঃ) কখন সিজদায় যায়, তারপর আঁ হযরত (সঃ) যখন সিজদায় গেলেন সে ঐ নাড়ি-ভুঁড়ি তাঁর (সঃ) এর দুই বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে পিঠের উপর রেখে দেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি সবকিছু দেখছিলাম কিন্তু আমার করার কিছুই ছিল না। হায় যদি তাদের আটকানোর মতো আমার শক্তি থাকতো! এরূপ করার পর তারা হাসতে হাসতে একে অপরের উপর গড়িয়ে পড়ছিল অথচ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সেজদার মধ্যেই ছিলেন। তিনি মাথা উঠাতে পারছিলেন না। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে হযরত ফাতেমা আসলো এবং তিনি তাঁর কোমর থেকে সেসব নাড়ি-ভুঁড়ি নামালো এরপর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মাথা উঠালেন। তারপর তিনি (সঃ) তিন বার বললেন হে খোদা! "এই কুরাইশদের তুমিই শামলাও" এবং এ বদদোয়া তাদের খুবই খারাপ লাগলো। কারণ তারা জানতো যে, হুযূর (সঃ)-এর দোয়া কবুল হয়। এরপর তিনি অনেকের নাম নিয়ে দোয়া করলেন হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আবু জাহেল, উতবা বিন রবিয়া, শিবা বিন রবিয়া, ও

ওলিদ বিন ওকবা, উমাইয়া বিন খালফ, উকবা বিন আবি মুয়িবকে পাকড়াও করার জন্য দরখাস্ত করছি। বর্ণনাকারী বলেন আঁ হযরত (সঃ) ৭ম ব্যক্তির নাম বলেছিলেন কিন্তু আমার স্মরণ নেই। কিন্তু বর্ণনাকারীর বর্ণনা এটাই যে, আমি তার কসম খেয়ে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ, যে সমস্ত লোকের নাম সেদিন দোয়ার মধ্যে হুযূর (সঃ) নিয়েছিলেন বদরের যুদ্ধে তারা নিহত হওয়ার পর তাদের সবাইকে আমি এক গর্তে পড়ে থাকতে দেখেছি।" (বুখারী কিতাবুল ওযু ইযা আলকা আলা যাহারাল মুসাল্লা)

তো এ কবুলিয়তে দোয়ার দৃশ্য আল্লাহ্‌র প্রিয়রাই দেখিয়ে থাকেন। কোন দুনিয়াবী ব্যক্তি যিনি দুনিয়ার মোহে আসক্ত এইরূপ দৃশ্য দেখাতে পারেন? অল্পদিনের মধ্যেই সবকিছু পূর্ণ হতে দেখা গেল। তারপর আঁ হযরত (সঃ) নিজে তাঁর মনোবাসনার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন "আল্লাহ্‌তাআলা প্রত্যেক নবীর একটি মনোবাসনা রক্ষা করেছেন এবং আমার মনোবাসনা হচ্ছে রাতের ইবাদত" (আল মু'জিমিল কবির আরতি তিবরানী ১২ খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৪)

এরপর দেখতে পাই যে, সেই রাতের ইবাদতের মধ্যে উন্নত নমুনা কায়েম করেছেন যার দৃষ্টান্ত পাওয়া সম্ভব নয়। এ বিষয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) আনহা এর সাক্ষ্য রয়েছে। রসূল করীম (সঃ) এর নামায অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামাযের অনুভূতি সম্পর্কে তিনি (রাঃ) আনহাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, হুযূর (সঃ) রমযানে অথবা অন্যান্য দিনে এগারো রাকাতের বেশি পড়তেন না কিন্তু তা এতো দীর্ঘ এতো সুন্দর নামায হতো যে, সে নামাযের দীর্ঘতা এবং সৌন্দর্যের বিষয়ে জিজ্ঞেস করোনা। অর্থাৎ আমার কাছে সে ভাষা নেই যার মাধ্যমে আমি সেই সৌন্দর্য মন্ডিত নামাযের চিত্র তুলে ধরতে পারি। (বুখারী কিতাবুল জুমুআ বাব কিয়ামুন্নাবিঈ বেলায়লিন ফি রামাযান)

এক বর্ণনায় এসেছে মুতরেফ নিজের পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহ্ (সঃ) কে এতো ব্যাকুলভাবে নামায পড়তে দেখলাম যে তাঁর (সঃ) এর বুক থেকে এমন আওয়াজ আসছিল যেমন চাক্কি (আটার মেশিন) থেকে আওয়াজ আসে।

(সুনানে আবি দাউদ কিতাবুস সালাত বাবেলেফায়ে ফিস সালাত)

অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, তাঁর বুক থেকে এমন আওয়াজ আসতো যেমন ফুটন্ত হাড়ি থেকে আওয়াজ এসে থাকে। (সুনানে নিসাই কিতাবুস সাহু বাবুল বাকায়ে ফিসসালাত)

"আল্লাহ্‌তাআলা প্রত্যেক নবীর একটি মনোবাসনা রক্ষা করেছেন এবং আমার মনোবাসনা হচ্ছে রাতের ইবাদত"

হযরত আওফ বিন মালেক আশযায়ি বলেন, এক রাতে আমি নবী করীম (সঃ) এর সাথে ইবাদত করার তৌফিক লাভ করি। তিনি প্রথমে সূরা বাকারা পড়েন, তিনি (সঃ) যখন কোন রহমতের আয়াতে পৌঁছতেন তখন সেখানে থেমে দোয়া করতেন এবং যখন আযাবের আয়াতে পৌঁছতেন তো সেখানে থেমে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তারপর ক্বিয়াম দাঁড়ানো অবস্থা এর সমান তিনি রুকু করতেন। অর্থাৎ যতক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে তেলাওয়াত করেন ততক্ষণ রুকুতেও দেরী করেন, যার মধ্যে তসবীহ্ তাহ্‌মীদ করেন। তরপর কিয়ামের সমান সেজদা করেন, সিজদাতেও ঐরূপ তসবীহ্ দোয়া করেন। তারপর দাঁড়িয়ে সূরা আল ইমরান পড়েন। তারপর প্রত্যেক রাকাতে একটি করে সূরা পড়েন। (আবু দাউদ কিতাবুসসালাত-বাব ফিদ্দোয়ায়ে মা ইয়াকুররাজুলু ফি রুকুয়েহী ওয়া সুযুদিহি)

তো এভাবে থেমে থেমে, বুঝে-শুনে, রহমত এবং আযাবের জায়গায় দোয়া করে আশ্রয় চাওয়া, এ চিন্তা করা কোন সাধারণ বিষয় ছিল না। এ দোয়া এবং চিন্তা-ভাবনা এতো উন্নত মানের ছিল যেখানে মানুষের চিন্তা পৌঁছা অনেক মুশকিল। এজন্যই তো হযরত আয়েশা (রাঃ) আনহা বলেছেন, যে তাঁর নামাযের সৌন্দর্যের বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করো না কারণ সেটা বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

তারপর হযরত হুযাইফা (রাঃ) বিন ইমান বলেন তাঁর সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর ভেতরের খবর রাখতেন। এক রাতে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর সঙ্গে নামায আদায় করেন। যখন নামায শুরু করেন তখন তিনি (সঃ) বলেন আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান যিনি ক্ষমতাবান এবং যার মহিমা বিস্তৃত এবং যিনি মহান। এরপর তিনি সূরা বাকারা শেষ করেন। তারপর রুকু করেন যা কিয়ামের সমান ছিল। তারপর রুকুর সমান দাঁড়িয়ে থাকেন। এরপর সেজদা করেন যা কিয়ামের সমান ছিল। তারপর দুই সেজাদার মধ্যবর্তী সময়ে রাব্বিগফিরলী, রাব্বিগফিরলী, আমার খোদা আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার খোদা আমাকে ক্ষমা করে দাও, বলতে বলতে এতো দেরী করতেন যত দেরী সেজদায় করেছিলেন। তারপর দ্বিতীয় রাকাতে তিনি আল ইমরান, নিসা, মায়েদা, আনাম ইত্যাদি লম্বা সূরা পড়েন। (আবু দাউদ কিতাবুস সালাত বাব মাইয়াকুলু ররাজুলূ ফি রুকুয়িহি ও সুযুদিহি)

তো দেখুন এই ছিল তিনি (সঃ) এর ইবাদতের মান। এজন্য বর্ণনায় এসেছে অনেক সময় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর পা ফুলে যেত। হযরত আয়েশা (রাঃ) আনহা বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সঃ) রাতে এতো লম্বা নামায পড়তেন যে, তাঁর পা ফুলে ফেটে যেত। একবার আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল, আপনি কেন এতো কষ্ট করেন অথচ আল্লাহ্‌তাআলা আপনার পূর্বের এবং পরের সকল গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। তিনি (সঃ) বলেন আমি কি চাইব না যে, আল্লাহ্‌তাআলার শোকরগুজার বান্দা হই। (বুখারী কিতাবুত তাফসীর সূরা ফাতাহ্)

এরপর উম্মুল মু'মেনীন হযরত সওদা (রাঃ) আনহা এর একটি বর্ণনা আছে। যিনি একেবারেই সাদা-সিধে মেজাযের এবং নেক ছিলেন। এক রাত্রে তিনি নবী করীম (সঃ)-

এর সাথে নামায পড়ার এরাদা করলেন। এবং হুযুরের সঙ্গে গিয়ে নামাযে শামিল হলেন। জানতে পারেনি কতক্ষণ নামাযে ছিলেন কিন্তু তাঁর নিজের সাদা আচরণের কারণে দিনের বেলায় রসুলুল্লাহ্ (সঃ) কে এর সামনে ঐ লম্বা নামাযের উপর যে আলোচনা করেন তা থেকে হুযুর (সঃ) অনেক খুশী হলেন। বললেন ইয়া রসুলুল্লাহ্ রাতে আপনি এতো লম্বা রুকু করিয়েছেন যে, আমার কাছে মনে হয়েছে যে, ঝুঁকে থাকতে থাকতে আমার নাক থেকে রক্ত না বের হয়ে যায়। (আল আসবাহ্ ফি তামিজিসসাহাবাহ্ ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৭২১)

তারপর আরেক রেওয়ায়েতে এসেছে আতা বর্ণনা করেন যে, একবার আমি ইবনে উমর (রাঃ) এবং উবাইদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ)-এর সঙ্গে হযরত আয়েশা (রাঃ) আনহা এর কাছে গেলাম। আমি উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) এর কাছে আবেদন করলাম যে, আমাক রসুলুল্লাহ্ (সঃ) এর কোন বিশেষ কথা বলুন যা আপনি নিজের চোখে দেখেছেন। একথা শুনে হযরত আয়েশা (রাঃ) আনহা তাঁর (সঃ)-এর কথা স্মরণ করে অস্থির হয়ে কেঁদে ফেললেন এবং বলতে লাগলেন যে আঁ হযরত (সঃ)-এর প্রত্যেক কাজ সুন্দর ছিল। একবার আঁ হযরত (সঃ) এক রাতে আমার কাছে আসলেন। আমার সঙ্গে আমার বিছানায় শুয়ে পড়েন। এরপর তিনি বলেন হে আয়েশা! আজকের রাতে তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে যে, আমি আমার প্রভুর ইবাদত করি। আমি বললাম খোদার কসম! আমার তো আপনার ইচ্ছার প্রতি সম্মান আছে এবং আপনার নৈকট্য পছন্দনীয়। আমার পক্ষ থেকে আপনাকে অনুমতি দেয়া হলো। তিনি উঠলেন এবং মশক থেকে পানি নিয়ে ওযু করলেন। নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন, এবং নামাযের মধ্যে এতো কান্নাকাটি করলেন যে, অশ্রু বয়ে বুকের উপর পড়তে লাগলো। নামাযের পর তিনি ডানদিকে হেলান দিয়ে এভাবে বসে পড়লেন যে, তাঁর ডান হাত ডান গালের উপর ছিল। এরপর তিনি কান্না শুরু করলেন, এ অবস্থায় অশ্রু মাটিতে পড়তে লাগলো। তিনি (সঃ) ঐ অবস্থায়ই ছিলেন, ফযরের আযানের পর বেলাল আসলো, যখন তিনি (সঃ) কে এভাবে কান্নাকাটি করতে দেখলেন তো হযরত বেলাল বললেন,ইয়া রসূলুল্লাহ্ আপনি এতো কাঁদছেন কেন, যখন আল্লাহ্ তাআলা আপনার অতীতের এবং ভবিষ্যতের সকল গুণাহ্ মাফ করেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বল্লেন, আমি কি আল্লাহ্র শোকরগুজার বান্দা হবো না (তফসীর রুহুল বায়ান জেরে তফসীর সূরা আলে ইমরান আয়াত ১৯১-১৯২)।

হে আয়েশা!
আজকের রাতে তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে যে, আমি আমার প্রভুর ইবাদত করি। আমি বললাম খোদার কসম! আমার তো আপনার ইচ্ছার প্রতি সম্মান আছে এবং আপনার নৈকট্য পছন্দনীয়। আমার পক্ষ থেকে আপনাকে অনুমতি দেয়া হলো। তিনি উঠলেন এবং মশক থেকে পানি নিয়ে ওযু করলেন। নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন

এটা এক দুইবারের ঘটনা ছিল না। অধিকাংশ সময় এমন ঘটনা ঘটতো। বরং প্রত্যেহ প্রত্যেক স্ত্রীর মধ্যেই এমন দৃশ্য দেখা যেত। এখন দেখুন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে তিনি আসলেন। যখন নয়জন স্ত্রী ছিল এমন নয় দিনের পরেই আসতো। হযরত আয়শা (রাঃ) আনহা তাঁর (সঃ) এর সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী ছিল, এতে কোন সন্দেহ নেই। প্রিয় এজন্য যে, সেই স্ত্রীর ঘরেই সবচেয়ে বেশি ওহী নাযেল বা আল্লাহ্তাআলার কালাম অবতীর্ণ হত। তো এখানেও স্নেহ এবং ভালবাসার মান আল্লাহ্তাআলার গুণাবলীর সাথে সম্পৃক্ত। নয়দিন পরে যখন এই স্ত্রীর কাছে আসেন তখন বলছেন মন অস্থির, আমাকে খোদার ইবাদত করতে দাও। সারারাত ইবাদত করে কান্নাকাটি করে মাটিকে ভেজাতে থাকে। আর এভাবে তাঁর (সঃ) এর সারারাত কেটে যেত এবং সেই প্রভূর শোকরগুযারী করতে থাকেন যিনি তার উপর এতো এহসান করেছেন। কোন দুনিয়াদার ব্যক্তি এমন আমল করতে পারেন? কিন্তু দুনিয়াদারের এবং অন্ধদের এ মান হতে পারে না। তাদের তো মান অন্য রকম। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন–

"খোদাতাআলা তাঁর বান্দার সিফতের উপর বলেন (সূরা ফুরকান ৬৫) যে, সে তার সমস্ত রাত সিজদা এবং কিয়ামে এর মধ্যে কাটিয়ে দেন। এখন দেখুন দিনরাত স্ত্রীদের নিয়ে মেতে থাকা ব্যক্তি কিভাবে আল্লাহ্তাআলার ইচ্ছা অনুসারে রাত ইবাদতের মধ্যে কাটিয়ে দেয়। স্ত্রীদের কাজ কি হয় তারা বরং খোদার জন্য অংশিদার সৃষ্টি করেন। আঁ হযরত (সঃ) এর নয়জন স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সারারাত ইবাদতের মধ্যে কাটাতেন। একবার তাঁর রাত্রি যাপন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)-এর ঘরে ছিল, রাতের কিছু অংশ চলে গেছে এমন সময় হযরত আয়েশা (রাঃ) এর চোখ খুলে দেখলেন তিনি (সঃ) নেই। তাঁর সন্দেহ হল যে, তিনি হয়তো অন্য স্ত্রীর ঘরে গেছেন। তিনি উঠে প্রত্যেক ঘরে খুঁজলেন কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। পরিশেষে দেখলেন যে, তিনি কবরস্থানে এবং সেজাদার মধ্যে কাঁদছেন। এখন দেখুন যে, তিনি জীবন্ত এবং প্রিয় স্ত্রীকে ছেড়ে মৃতদের জায়গা কবরস্থানে গেছেন এবং কাঁদছেন। তাহলে কি তাঁর (সঃ) এর স্ত্রীরা আয়েশ-আরাম অথবা শারিরীক আনন্দের জন্য ছিল এটা হতে পারে?" (মলফূযাত ৪র্থ খন্ড, ৫০-৫১পৃষ্ঠা নতুন সংস্করণ)

কিন্তু আপত্তি উত্থাপনকারীদের এই বিষয়টি কখনো চোখে পড়বে না।

এই ঘটনাটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে এর বিস্তারিত হযরত আয়শা (রাঃ) এভাবে বর্ণনা করেন।–এক রাতে হুযূর (সঃ) আমার কাছে আসে। হুযূর (সঃ) শুয়ে পড়েন কিন্তু ঘুমাননি। কিছুক্ষণ পর উঠে এসে বসেন

এবং কাপড় পড়েন। হযরত আয়শা বলেন আমার মনে শক্ত গায়রতের সৃষ্টি হল। আমার মন হল হুযূর (সঃ) আমার কোন সতীনের ঘরে যাচ্ছেন। তিনি বলেন আমি তাঁর (সঃ) এর পেছনে পেছনে গেলাম, তো আমি তাঁকে বাকী কবরস্থানে দেখলাম। তিনি (সঃ) মু'মেন পুরুষ, মহিলা এবং শহীদদের জন্য ক্ষমা চাচ্ছিলেন। হযরত আয়শা (রাঃ) আনহা বলেন–আমি মনে মনে বলছিলাম আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গীত। তিনি (সঃ) তাঁর প্রভূর কাছে চেয়ে যাচ্ছিলেন। আর আমি দুনিয়াবী খেয়ালের মধ্যে ডুবে আছি। আমি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে ফিরে আসি। কিছু সময় পরে হুযূর (সঃ) আমার কাছে আসলেন তখন দ্রুত চলার কারণে আমি হাঁপাচ্ছিলাম। তো হুযূর (সঃ) বললেন হে আয়শা তুমি হাঁপাচ্ছো কেন? তো আমি হুযূরকে সব কথা বললাম। এরপর তিনি বললেন, হে আয়শা! তোমার কি এই বিষয়ে ভয় আছে যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সঃ) তোমার হক্ব নষ্ট করবে। আসল কথা হচ্ছে জিবরাঈল আমার কাছে আসল এবং বললেন এটা শাবানের অর্ধেক রাত আর এই রাতে আল্লাহ্তাআলা এক ভেড়ার চুলের সংখ্যার সমান মানুষকে আগুন থেকে নাজাত দেবেন। অর্থাৎ অধিক পরিমাণে নাজাত দেবেন। এই রাতে কোন মুশরেকের উপর দৃষ্টি দেবেন না। না কোন বেরহম ব্যক্তির উপর এবং না কোন অহংকারী ব্যক্তির উপর যে অহংকারে কাপড় লটকিয়ে রাখে এবং না কোন ব্যক্তি যে পিতা মাতার নাফরমানী করে এবং না কোন মদখোর ব্যক্তির উপর দৃষ্টি দেবেন। তো হযরত আয়শা বলেন যে, হুযুর (সঃ) যে চাঁদর পরিধান ছিলেন তা নামালেন এবং আমাকে বললেন হে আয়শা! তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে যে, আমি আজকের বাকী রাত ইবাদতের মধ্যে কাটিয়ে দেই। আমি বললাম আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত। অবশ্যই। তখন হুযূর নামায শুরু করলেন এবং এতো লম্বা সেজদা করলেন যে, আমার এই ধারণা হলো, হয়তো তাঁর দম বের হয়ে গেছে। (মারা গেছে)। বলেন, আমি তাঁর পায়ে নাড়া চাড়া করে ছুঁয়ে দেখি তো তাঁর পায়ে নাড়াচাড়া শুরু হয়। আমি তাঁকে সেজদায় দোয়া করতে শুনি। সকালে হুযূর (সঃ) বলেন, যে দোয়া আমি রাতে সেজদায় করছিলাম তা জিব্রাঈল আমাকে শিখিয়েছেন এবং আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি সেজদায় তা বারবার পড়ি। (তফসীর আদ দুররে মনসুর ৬ষ্ঠ খন্ড ২৭ পৃষ্ঠা)

এখন বলুন এরকম উত্তম গুণাবলীর মানুষ পৃথিবীতে আর কেউ আছে যে সারারাত নিজের প্রভুর কাছে মানুষের জন্য ক্ষমা চেয়ে কাটিয়ে দেয়। নিজের প্রভূর প্রেমে মত্ত এবং তার সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি তাঁকে অস্থির করে দেয়। নিজের রাতের ঘুমের কোন পরওয়া নেই নিজের সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রীরও কোন গুরুত্ব নেই। বাসনা যদি থেকে থাকে তাহলে এটুকুই যে, আমার খোদা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হোক এবং তার সৃষ্টি আযাব থেকে বেঁচে যাক।

এখন বলুন এরকম উত্তম গুণাবলীর মানুষ পৃথিবীতে আর কেউ আছে যে সারারাত নিজের প্রভুর কাছে মানুষের জন্য ক্ষমা চেয়ে কাটিয়ে দেয়। নিজের প্রভূর প্রেমে মত্ত এবং তার সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি তাঁকে অস্থির করে দেয়। নিজের রাতের ঘুমের কোন পরওয়া নেই নিজের সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রীরও কোন গুরুত্ব নেই। বাসনা যদি থেকে থাকে তাহলে এটুকুই যে, আমার খোদা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হোক এবং তার সৃষ্টি আযাব থেকে বেঁচে যাক। তিনি (সঃ) এর রাত কিভাবে কাটাতো তার আর একটি দৃষ্টান্ত দেখুন–

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) আনহা বলেন, তিনি (সঃ) কিছু সময় শুইতেন কিছুক্ষণ পর উঠে নামাযের মধ্যে মগ্ন থাকতেন। আবার শুয়ে পড়তেন, আবার উঠে বসতেন এবং নামায আদায় করতেন সকাল পর্যন্ত এই অবস্থায়ই জারি থাকতো। (বুখারী কিতাবুত তাফসীর বাব ইয়াগফেরুল্লাহ্)

হযরত আয়েশা (রাঃ) আনহা এর এক বর্ণনায় এসেছে যে, এক রাতে আমার ঘরে রাত্রি যাপনকালে তিনি বাইরে গেলেন। আমি দেখি একটি কাপড়ের টুকরার মতো পড়ে আছেন এবং বলছেন হে আল্লাহ্ তোমার জন্য আমার শরীর এবং প্রাণ সেজদায় আমার মন তোমার উপর ঈমান নিয়ে আসছে। হে আমার খোদা! আমার দুই হাত তোমার সামনে প্রসারিত এবং যা কিছু আমি তাদের মাধ্যমে নিজের প্রাণের উপর যুলুম করেছি তা তোমার সামনে আছে। হে মহান! যার মাধ্যমে মহান বিষয়ের আশা করা যায়, মহাপাপসমূহকে তুমি ক্ষমা করে দাও। তারপর বলেন হে আয়শা জিব্রাঈল আমাকে এই কথাগুলো শিখিয়েছেন পড়ার জন্য। তুমিও সেজাদার মধ্যে এগুলো পড়ো। যে ব্যক্তি এই কথাগুলো পড়বে সেজদা থেকে মাথা উঠানোর পূর্বে তাঁর গুনাহ্ মাফ করা হয়। (মাজমায়ুজ্জাওয়ায়েদ হেছমি দ্বিতীয় খন্ড ১২৮ পৃষ্ঠা প্রকাশ বৈরুত)

তিনি (সঃ) এর এটা পছন্দনীয় ছিল না যে আরামদায়ক বিছানায় শয়ন করা এবং গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থেকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল থাকা। হযরত হাফছা (রাঃ) বর্ণনা করেন এক রাতে তিনি বিছানার চাদরকে চার ভাঁজ দিলে একটু নরম হয়। সকালে তিনি বললেন রাতে তুমি কি বিছিয়ে ছিলে। ওটাকে এক ভাঁজে রেখ। ওটা আমাকে নামায থেকে বিরত রেখেছে। [আশশামায়েলু ন্নবুয়া তিরিমিযি বা মা যায়া ফি ফারাশে রাসুলুল্লাহ্ (সঃ)] হয়তো কিছুক্ষণের জন্য গভীর ঘুম এসে গিয়েছিল এবং তার (সঃ) এর এটা পছন্দ ছিলনা যে, ক্ষণিকের জন্যও আল্লাহ্ স্মরণ থেকে গাফেল থাকা।

হযরত আয়শা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, যখনই রসুলুল্লাহ্ (সঃ) কোন কারণে বা

অসুস্থতার জন্য তাহাজ্জুদ পড়তে পাড়তেন না তাহলে আঁ হযরত (সঃ) দিনের বেলায় ১২ রাকায়াত নফল আদায় করে নিতেন। (সহিহ্ মুসলিম ১ম খন্ড ৫১৫ পৃষ্ঠা)

খোদার ইবাদতের ব্যাপারে তিনি তাঁর স্বাস্থ্যেরও পরওয়া করতেন না। এক বর্ণনায় হযরত আনাছ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সঃ) একটু অসুস্থ ছিলেন সাহাবারা বললেন হে আল্লাহ্‌র রসূল আজকে আপনার উপর অসুস্থ্যতার ছাপ পড়েছে। তিনি (সঃ) বললেন এই দুর্বলতার পরও আমি আজকে তাহাজ্জুদের নামাযে লম্বা সূরা পড়েছি। (আল ওফায়ে বে আহ্‌ওয়ালেল মুস্ত ফা লিলজুযে পৃষ্ঠা ৫১১ বৈরুত) তিনি তাঁর উত্তম নমুনার মাধ্যমে নিজের উম্মত এবং সাহাবাদেরকে নছিহত করেছেন যে, খোদার ইবাদত থেকে গাফেল কখনো হবে না বিশেষভাবে তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য মনোযোগ আকর্ষণ করতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবি কায়েস (রাঃ) বর্ণনা করেন হযরত আয়শা (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামুল্লায়ল (তাহাজ্জুদ নামায) ছাড়বে না এজন্য রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ছাড়তেন না। যখন তিনি অসুস্থ হয়ে যেতেন এবং শরীরে দুর্বলতা অনুভব করতেন তো বসে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। (সুনানে আবি দাউদ আততারগিব ওয়াততারহিব)

তার ধারাবহিকতা ছিল এবং নছিহতও করেছেন। এজন্যই তো হযরত আয়শা (রাঃ) এ নছিহতকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তাঁর বাসনা ছিল যে আমার অনুসরণকারীগণও এভাবে নামাযে এবং তাহাজ্জুদে ধারাবাহিকতা অবলম্বন করবে।

হযরত কা'ব বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সর্বদা দিনের বেলায় সফর থেকে ফিরে আসতেন এবং প্রথমে মসজিদে যেতেন। সেখানে দুই রাকয়াত নফল আদায় করতেন এরপর কিছুক্ষণ সেখানে বসতেন। (সহিহ্ মুসলিম বাব ইস্তে জাবুররাকতাইনে ফিল মাসজিদে লেমান কাদামা মান সাফারে আউয়ালা কদুমে)

সাধারণ লোক সফর থেকে ফিরে এসে সোজা নিজের ঘরে যায় স্ত্রী সন্তানদের সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ থাকে। সফরের ক্লান্তি দূর করার ইচ্ছা থাকে। কিন্তু আমাদের প্রভূ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নিয়ম কি ছিল? তিনি প্রথমে নিজের প্রভুর কাছে হাজির হতেন। তার শোকরিয়া আদায় করতেন। তার রহম এবং ফযল প্রার্থনা করতেন। এরপর অন্য কাজ করতেন অথবা ঘরে যেতেন। উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের কত ভয়ানক অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনি (সঃ) নিজেও জখম হয়েছিলেন কিন্তু এসব কিছুই তাঁর ইবাদতের রাস্তায় বাঁধা হতে পারেনি। তাঁকে ইবাদতের রাস্তা থেকে দূরে রাখতে পারেনি।

> এক বর্ণনায়
> হযরত আনাছ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সঃ) একটু অসুস্থ ছিলেন সাহাবারা বললেন হে আল্লাহ্‌র রসূল আজকে আপনার উপর অসুস্থ্যতার ছাপ পড়েছে। তিনি (সঃ) বললেন এই দুর্বলতার পরও আমি আজকে তাহাজ্জুদের নামাযে লম্বা সূরা পড়েছি।

এক বর্ণনায় এসেছে ওহুদের যুদ্ধে সন্ধ্যায় যখন লোহার হেলমেটের ক্রু হুযূর (সঃ) ডান গালে ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে তাঁর (সাঃ) এর অনেক রক্ত ঝড়েছিল। তিনি (সঃ) জখমীর কারণে বেহুঁস ছিলেন। এছাড়াও ৭০ জন সাহাবা শাহাদাত তা থেকেও বেশি বেদনাদায়ক ছিল। সেই দিনেও তিনি বেলাল (রাঃ) এর আহ্বানে নামাযের জন্য সেভাবেই আসেন যেভাবে অন্যান্য সাধারণ দিনে আসতেন। (বুখারী কিতুবুল মাওয়াকিতুসসালাত বাবুল আযান বা'দা জাহাবালওয়াক্তে)

এমনিতে ঘটনা অনেক আছে। তিনি (সঃ) এর জীবনের প্রত্যেকটি অংশ ইবাদতের মাধ্যমে সাজানো ছিল। শুধু এটাই নয় বরং তাঁর উম্মতের লোকদের মধ্যেও, সাহাবাদের মধ্যে ইবাদতের মান কায়েম করে দেখিয়েছেন। নছিহত তখনই প্রভাব বিস্তার করে যখন নছিহতকারী নিজেই আমলের মাধ্যমে সর্বোচ্চ নমুনা দেখাবে। আর এ বিষয়ে কেউ বলতে পারবে না যে, তিনি যা বলেছেন তা করেননি। বরং সাহাবাদের হিংসা হতো যে আমরাও ততটুকু করবো যতটুকু তিনি করেন। আসল কথা হচ্ছে তিনি তাদের মধ্যে এক বিপ্লব সৃষ্টি করে দেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন "আমি অত্যন্ত জোর দিয়ে বলছি যে, সে যত বড় শত্রু হোক না কেন এবং সে খৃষ্টান হোক বা আর্য যখন সে এ অবস্থা দেখবে যা আঁ হযরত (সঃ) এর পূর্বে আরবে ছিল এরপর এ পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টি দিবে যা তাঁর (সঃ) এর তা'লিম এবং প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে, তাহলে তাকে নির্দ্বিধায় তাঁর (সঃ) এর সত্যতার সাক্ষ্য দিতে হবে।" কিন্তু অনেক এমন অন্ধ আছে যারা এভাবে অনুসন্ধান করে না অথবা দেখলেও চোখ বন্ধ করে রাখে। বলেন "মোট কথা হচ্ছে কুরআন মজীদ তাঁর প্রথম অবস্থার নক্‌শা তুলে ধরেছে....(সূরা মুহাম্মদ ঃ১৩) এটা আসলে তাদের কুফরের অবস্থা ছিল" অর্থাৎ তারা যেমনভাবে খায় যেভাবে জন্তু খেয়ে থাকে। কিন্তু "তারপর আঁ হযরত (সঃ) এর পবিত্র প্রভাবে তাদের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করেন যে, তাদের এ অবস্থা হয় যে, (সূরা ফুরকান ঃ ৬৫) অর্থাৎতারা তাদের প্রভুর সেজদা করে এবং কিয়াম করে রাত শেষ করে থাকেন। যে পরিবর্তন আঁ হযরত (সঃ) আরবের জংলীদের করেন এবং যে গর্ত থেকে বের করে উঁচু স্থানে পৌছিয়ে দেন সেসব অবস্থাকে দেখে মানুষ কাঁদতে বাধ্য হয় যে কত বড় মহান বিপ্লব তিনি সাধন করেছিলেন। দুনিয়ার কোন ইতিহাস এবং কোন জাতির মধ্যে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া সম্ভব নয়। এটা কোন মানব রচিত গল্প নয়। এসব ঘটনা যার সত্যতাকে এক সময় অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। (মলফূযাত ৫ম খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা, নতুন সংস্করণ)

তারপর রসূল করীম (সঃ) এর শেষ অসুস্থতার সময় তিনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত

ছিলেন। এ অবস্থাতেও যদি তাঁর কোন বিষয়ে চিন্তা ছিল তবে তা নামায ছিল। উদ্বিগ্ন অবস্থায় তিনি বারবার জিজ্ঞেস করেছেন নামাযের সময় কি হয়ে গেছে? বলা হয়েছে যে, লোকজন আপনার অপেক্ষায় আছে। জ্বর হালকা করার জন্য তিনি বলেছেন আমার উপর মশক থেকে পানি ঢালো। পানি ঢালো। নির্দেশ পালন করা হয়েছে। হুকুম পালন করা হয়েছে। আবার অজ্ঞান হয়ে যান। আবারও জ্ঞান ফিরে এসেছে, তারপর জিজ্ঞেস করেন নামায হয়ে গেছে? যখন জানলেন সাহাবারা তাঁর অপেক্ষায় আছে তো বললেন, আমার উপর পানি ঢালো। আবার পানি ঢালা হয়েছে। এভাবে পানি ঢালতে ঢালতে জ্বর একটু কম হলে মসজিদের দিকে যেতে থাকেন। কিন্তু দূর্বলতার কারণে অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং মসজিদে যেতে পাড়লেন না। (বুখারী মাগাজী বাব মারাজান্নাবিঈ ওয়া ওফাতিহি)

হযরত আয়শা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ যখন তিনি (সঃ) মৃত্যুর অসুখে পড়লেন, আর দুর্বলতার কারণে নামায পড়ার শক্তি ছিল না; এজন্য তিনি (সঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) কে নামায পড়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। যখন হযরত আবু বকর (রাঃ) নামায পড়ানো শুরু করেন তখন তিনি (সঃ) একটু আরাম অনুভব করেন এবং নামাযের জন্য বের হলেন। হযরত আয়শা (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) কে নামায পড়ানোর নির্দেশ দেয়ার পর যখন নামায শুরু হয়ে যায় তো তিনি (সঃ) জ্বর একটু কম অনুভব করেন তখন তিনি দুই ব্যক্তির সাহায্যে মসজিদের দিকে যাওয়া শুরু করেন। তিনি বলছেন আমার চোখের সামনে এই দৃশ্য ছিল যে, ব্যাথার চোটে সে সময় তাঁর পা মাটির সঙ্গে হেঁচড়ে যাচ্ছিল। তাঁকে দেখে হযরত আবু বকর (রাঃ) এরাদা করলেন পেছনে সরে আসার। এই অবস্থা দেখে রসূল করীম (সঃ) আবু বকর (রাঃ) কে ইশারা করে বলেন নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাক। এরপর তাঁকে সেখানে নিয়ে আসা হয়। তারপর তাকে আবুবকর (রাঃ)এর কাছে বসানো হয়। এরপরে রসূল করীম (সঃ) নামায পড়া শুরু করেন আর যখন তিনি (সঃ) একটু নড়াচড়া করতেন তখন আবু বকর (রাঃ) তকবীর বলতেন, আল্লাহু আকবার বলতেন। বাকী লোক হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পেছনে নামায পড়লেন।"

হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সঃ)এর শেষ ওসীয়্যত এবং আখেরী পয়গাম ছিল, যখন তিনি (সঃ) মৃত্যুপথযাত্রী এবং নিঃশ্বাস উঠানামা-করছিল তা ছিল নামায এবং দাসদের অধিকার আদায় সম্পর্কে। [সুনানে ইবনে মাজাহ্, কিতাবুল ওসায়া বাব হাল আওসা (সঃ)]।

> আঁ হযরত (সঃ)এর শেষ ওসীয়্যত এবং আখেরী পয়গাম ছিল, যখন তিনি (সঃ) মৃত্যুপথযাত্রী এবং নিঃশ্বাস উঠানামা-করছিল তা ছিল নামায এবং দাসদের অধিকার আদায় সম্পর্কে।

এটা হুকুকুল্লাহ্-আল্লাহ্র অধিকার এবং হুকুকুল ইবাদ বান্দার-অধিকার এর উত্তম সারাংশ, যা রসূল করীম (সঃ) নিজের উম্মতের জন্য নির্ধারণ করেছেন; সেই পাক নবীর উপর হাজার হাজার সালাম এবং দরূদ যিনি নিজে ইবাদতের উন্নত মান কায়েম করেছেন এবং নিজের উম্মতকেও নছিহত করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রাঃ) আঁ হযরত (সঃ) এর প্রশংসায় এই পংক্তি রচনা করেন–

ইয়াবেতু ইউজাকি জানবাহু আর ফেরাসিহি ইয়াস তাছকালাত বিল মুশরেকীনাল মাফযেযূ।

তিনি সেই সময় বিছানা থেকে আলাদা হয়ে রাত কাটিয়ে দেন যখন ঘুমের কারণে মুশরেকদের জন্য বিছানা ছাড়া কঠিন মনে হয়। (বুখারী কিতাবুল জুমুআ)

মোটকাথা, যে সকল লোক এসব বাজে এবং অপ্রয়োজনীয় কথা পত্রিকায় লিখেন, তাদের জন্য আমি গত সপ্তাহে জামাতকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছিলাম। আমার মনে হয়েছে যে, অঙ্গসংগঠন খোদ্দামুল আহমদীয়া, লাজনা ইমাইল্লাহকে বলবো যে, তারাও যেন এ বিষয়ে দৃষ্টি দেয়, কেননা, ছেলেরা, যুবকরা আজকাল ইন্টারনেট এবং সংবাদপত্রের দিকে মনোযোগ দিয়ে থাকে এবং তাদের তরবীয়তের জন্য এটা জরুরী যে, সে সব পত্রিকার প্রতি দৃষ্টি রেখে সেগুলোর যথা সম্ভব উত্তর দেয়া। এজন্য এখানে খোদ্দামুল আহমদীয়া যেন কমপক্ষে ১০০ এমন লোকের সন্ধান করে যারা ভাল শিক্ষিত হবে ধর্মের জ্ঞান রাখবে। এভাবে লাজনা ১০০ যুবতীকে সন্ধান করে টিম বানাবে এবং এমন প্রবন্ধ রচনাকারীকে সংক্ষিপ্ত চিঠির আকারে উত্তর দিবে ঐসব পত্রিকায় পাঠাবে যার মধ্যে এসব প্রবন্ধ ছাপানো হয় অথবা পত্র আসে।

আজকাল পুনরায় পত্রিকায় ধর্মের স্বাধীনতার ব্যাপারে কথাবার্তা হচ্ছে। এভাবে অন্যান্য দেশেও যেখানে যেখানে এসব আপত্তি তোলা হয়, সেখানেও পত্রিকায় অথবা ইন্টারনেটে পত্রের আকারে উত্তর লেখা যেতে পারে। এসব পত্র অঙ্গ সংগঠনের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনায় হতে হবে কিন্তু এসব কেবলমাত্র একটি টিমের Effort-এ হবে না বরং অনেক লোক একত্রিত করতে হবে। আলাদা আলাদা ভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি পত্র লিখবে। অর্থাৎ ১০০ খোদ্দাম যদি উত্তর দেয় তাহলে প্রত্যেকেই নিজস্ব ভঙ্গিতে উত্তর দিবে। প্রত্যেক পত্রের উত্তর এমন হবে যে, কেউ কেউ ইতিহাসের কোন ঘটনার সাক্ষি আবার কেউ কেউ কুরআন করীমের সাক্ষি উপস্থাপন করে উত্তর দিবে। এভাবে বিভিন্ন আঙ্গিকে পত্র গেলে....এক চিত্র ফুটে উঠবে। এক সৌন্দর্য প্রকাশিত হবে এবং মানুষ জানতে পারবে যে, এরা কত সুন্দরভাবে, কথার অলংকারের মাধ্যমে উত্তর দিয়ে নিশ্চুপ করে দেয়।

অনুবাদ– মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন

মুরব্বী সিলসিলা

ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে সব রকম দুর্যোগের মোকাবেলা করা

[হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কর্তৃক ১৪ অক্টোবর, ২০০৫ তারিখ মসজিদ বায়তুল ফুতূহ্, (মরডেন) লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তা'আব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা বাকারার নিম্নোক্ত ১৫৫-১৫৭ আয়াত তেলাওয়াত করে খুতবা দেন ঃ

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ۭ بَلْ اَحْيَاۗءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ۝

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ۭ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۝

الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝

[অর্থ ঃ আর যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয় তাদের সম্বন্ধে বলো না তারা মৃত। বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা বুঝতে পারছো না।

আর অবশ্যই আমরা ভয়ভীতি, ক্ষুধা এবং ধনসম্পদ ও প্রাণ এবং ফলফলাদির ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করবো। আর ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও,

যারা তাদের ওপর বিপদে এলে বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্রই এবং নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাব]

বিগত দিনগুলোতে এমন দু'টি ঘটনা ঘটে গেছে সেগুলো প্রত্যেক আহমদী তিনি যেখানেই বসবাসকারী আহমদী হোন না কেন দুঃখ ও ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়েছেন। বিভিন্ন দেশ থেকে পত্রাদির মাধ্যমে এর প্রকাশ ঘটেছে। বিশেষ করে পাকিস্তানী আহমদীদের জন্যে এ দুটো দুঃখই খুবই কষ্টদায়ক। প্রতিটি অন্তর অস্থির হয়ে গেছে। একটি ঘটনা তো বিগত জুমুআর দিন ঘটেছে। জুমুআর শেষে আমি এর উল্লেখও করেছি। দ্বিতীয় ঘটনা পরের দিন সকাল বেলা ভয়াবহ ভূমিকম্পের আকারে ঘটেছে। পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চল ও কাশ্মীরের ব্যাপক স্থানে এ ভয়াবহ ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়েছে।

প্রথম ঘটনার সাথে যতটা সম্পর্ক তাতে আমরা জানি, ঐশী জামাতের ওপর পরীক্ষা এসেই থাকে। নবীর (আঃ) ওপর এ ধরনের কঠোরতা ও নির্যাতন চলেছে আর তাঁরা সব সময় আল্লাহ্তাআলার সমীপে কান্নাকাটি করেছেন এবং ধৈর্যের আঁচল কখনও হাত থেকে ছাড়েননি। আহমদী জামাতের বিগত এক শ' বছরের অধিক কাল এর সাক্ষ্য দিচ্ছে। যখনই জামাতের ব্যক্তি পর্যায় বা জামাতি পর্যায়ে এ রকম ঘটনা ঘটেছে জামাতের ব্যক্তিবর্গ ধৈর্য ও সাহসের সাথে সব রকম যুলুম নির্যাতন সহ্য করেছেন। কখনও নিজেদের হাতে আইন তুলে নেননি। আর ধৈর্যের ফলশ্রুতিতে প্রত্যেক ঘটনার পর আল্লাহ্তাআলা জামাতকে আগের চেয়ে বেশি অনুগৃহিত করেছেন এবং অনুগৃহিত করে চলেছেন, আর ইনশাআল্লাহ্ অনুগৃহিত করতে থাকবেন। তাই আজও জামাতের ব্যক্তিদের এবং বিশেষ করে সেসব লোক যাদের ভাই, সন্তানসন্ততি বা পরিবার শহীদ হয়েছেন বা আহত হয়েছেন সব সময় আল্লাহ্র সমীপে বিনত হয়ে ধৈর্যের সাথে তাঁর কৃপা ও আশিস চাইতে থাকা আবশ্যক। যেসব ব্যক্তি শহীদ হয়ে আল্লাহ্র দৃষ্টিতে অমরত্ব লাভ করেছেন এবং আহমদী জামাতের ইতিহাসের অংশে পরিণত হয়েছেন ভবিষ্যত প্রজন্ম তাদের কথা সব সময় স্মরণ করবে।

আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি এতে আল্লাহ্তাআলা এ বিষয়বস্তুই বর্ণনা করেছেন। যেসব লোক আল্লাহ্র পথে নিহত হয় তাদের সম্পর্কে একথা বলো না, তারা মারা গেছে। তারা মৃত নয়। কিন্তু তোমরা বুঝতে পারছো না। আল্লাহ্তাআলার দৃষ্টিতে কত বড় বৈশিষ্ট্য! তারা অমরত্ব লাভ করেছেন। অতএব 'মঙ্গ'-এর এ আট শহীদ আল্লাহ্তাআলার ভালবাসার দৃষ্টি লাভ করে নিয়েছেন। এসব লোকের রক্ত তো তখন প্রবাহিত করা হয়েছে যখন তারা খোদার সমীপে বিনত অবস্থায় ছিলেন। নিঃসন্দেহে এসব শহীদ আল্লাহ্র দৃষ্টিতে অমরত্ব লাভ করেছেন। অতএব প্রত্যেক আহমদী, যিনি

খোদার পথে প্রাণের উপঢৌকন উপস্থাপন করেছেন এবং শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেছেন তাদের প্রিয়জন ও আত্মীয়স্বজন এবং প্রত্যেক আহমদীর এটা দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক, খোদার খাতিরে কুরবানী দানকারী নিজ চিরস্থায়ী জীবন বানিয়ে গেছেন, সব সময়ের জীবন বানিয়ে গেছেন। যদিও তাদের সন্তানসন্ততি ও নিকটবর্তী প্রিয়জনের কাছে এ দুঃখ খুবই গভীর। কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে সুসংবাদ পাওয়ার পর সাহস ও ধৈর্যের সাথে আমাদের এটা সহ্য করতে হবে। আর এ পরীক্ষায় পুরোপুরি সফলকাম হতে হবে। তাদের জন্যে দোয়া করতে হবে।

যেভাবে আমি বলেছি, খোদাতাআলা জামাতের কুরবানী কখনও ব্যর্থ করেননি। আর এ কুরবানীও, ইনশাআল্লাহ্‌ ব্যর্থ হবে না। কিন্তু আবার সেই কথাই বলতে হয়, আমাদের ধৈর্যের মাধ্যমে কাজ করতে হবে। আমরা যখন ধৈর্য ধারণ করবো আমাদের জন্যে সুসংবাদও এ আকারে রয়েছে। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সবাইকে এর সৌভাগ্য দান করুন। আর আমরা সেসব লোকের মাঝে যেন গণ্য হই যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, আল্লাযীনা ইযা আসাবাতহুম মুসীবাতুন ক্বালূ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজি'উন অর্থাৎ এদের ওপর যখনই কোন বিপদআপদ এসে পড়ে তখন তারা ভয় পায় না বরং একথা বলে, আমরা তো আল্লাহ্‌রই। আর তাঁর দিকেই ফিরে যাবো। অতএব যখন এ বোধ সৃষ্টি হবে তখন আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর খাতিরে কুরবানী দানকারী ব্যক্তিবর্গের মর্যাদা তো উঁচু করে দিয়েই থাকবেন। এসব শহীদদের পেছনে থেকে যাওয়া লোকদের জন্যে এ পরীক্ষাও সহজ করে দেবেন। আর কেবল এ পরীক্ষা সহজ করে দেবেন তা-ই নয় এবং নিজ অনুগ্রহে বান্দা যে সম্বন্ধে চিন্তাও করতে পারে না এমন সব কল্যাণ ও অনুগ্রহে ভূষিত করবেন। একটি বর্ণনায় এসেছে। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, একজন মু'মিনের যদি দুঃখকষ্ট হয় এবং অভাব অনটন ও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়ে আর সে ধৈর্য ধারণ করে সেক্ষেত্রে তার এ কর্মকান্ডও তার জন্যে মঙ্গল ও কল্যাণের কারণে পরিণত হয়ে যায়। কেননা, সে ধৈর্য ধারণ করে পুণ্য অর্জন করে থাকে।

আল্লাহ্‌তাআলা শহীদগণের সব প্রিয়জনদের ধৈর্যের মাধ্যমে দুঃখ সহ্য করার সৌভাগ্য দান করুন এবং তাঁর দরবার থেকে অশেষ কল্যাণে ভূষিত করুন।

'সেই ব্যক্তি যে আন্তরিকতার সাথে তোমাদের ভালবাসে আর সত্যিকারভাবে তোমাদের জন্যে মরতে প্রস্তুত হয়ে থাকে এবং তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী তোমাদের আনুগত্য করে তোমরা কি তাকে ভালবাসবে না? আর তোমরা তাকে কি সবচেয়ে প্রিয় মনে করবে না? অতএব তোমরা যখন মানুষ হয়ে ভালবাসার পরিবর্তে ভালবেসে থাক সেক্ষেত্রে খোদা কি তা করবেন না?

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এ শিক্ষা সব সময় আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক। তিনি (আঃ) বলেছেন, 'খোদা প্রত্যেক পদবিক্ষেপে তোমাদের সাথী হবেন। আর তোমাদের ওপর কেউ প্রাধান্য লাভ করতে পারবে না। খোদার অনুগ্রহের জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর। গালিগালাজ শুনে চুপ থাক। মার খাও আর আর ধৈর্য ধর। যতটা সম্ভব মন্দ আচরণের মাধ্যমে বিরোধিতার জবাব পরিহার কর যেন আকাশে তোমাদের গ্রহণীয়তা লেখা হয়। নিশ্চিৎ স্মরণ রাখ, যে-ব্যক্তি খোদাকে ভয় করে এবং তার অন্তর খোদার ভয়ে বিগলিত হয়ে যায় খোদা তার সাথী হয়ে থাকেন'।

অতএব ধৈর্যের সাথে দোয়ায় লেগে থাকা হলো আমাদের কাজ। আমাদের সব ভয়ের ওপর খোদার ভয় প্রাধান্য লাভ করুক। আর তাঁর সন্তুষ্টি লাভ হোক আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। কোন কোন লোক তাড়াহুড়ো করে বিরুদ্ধবাদীর ওপর কখনও কখনও ধিক্কার দিতে থাকে অথবা অন্যের সাথে গা জ্বালা করে এমন কথাবার্তা বলতে থাকে। একজন আহমদীর এটা শোভা পায় না। কেউ আমাকে কারও সম্বন্ধে দোষারোপ করে লিখেছিল। আমরা আমাদের যে এক বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠা করে রেখেছি তা প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে, ইনশাআল্লাহ্।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন,

'সেই ব্যক্তি যে আন্তরিকতার সাথে তোমাদের ভালবাসে আর সত্যিকারভাবে তোমাদের জন্যে মরতে প্রস্তুত হয়ে থাকে এবং তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী তোমাদের আনুগত্য করে তোমরা কি তাকে ভালবাসবে না? আর তোমরা তাকে কি সবচেয়ে প্রিয় মনে করবে না? অতএব তোমরা যখন মানুষ হয়ে ভালবাসার পরিবর্তে ভালবেসে থাক সেক্ষেত্রে খোদা কি তা করবেন না? খোদা ভাল করেই জানেন আসলেই তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু কে আর কে বিশ্বাস- ঘাতক এবং পৃথিবীকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। সুতরাং তোমরা যদি এমন বিশ্বস্ত হয়ে যাও তাহলে তোমাদের আর তোমরা ছাড়া অন্যদের মাঝে খোদার হাত একটি পার্থক্য প্রতিষ্ঠা করে দেখাবেন।'

আবার তিনি (আঃ) বলেন,

'আর খোদা তোমাদের ব্যর্থ করে দেবেন এটা মনে করো না। তোমরা মাটিতে বপন করা খোদার হাতের একটি বীজ। খোদা বলেন, এ বীজ বাড়বে আর ফল দেবে এবং প্রত্যেক দিকে এর শাখাপ্রশাখা বের হবে এবং মহামহীরূহে পরিণত হবে। অতএব সেই ব্যক্তি কল্যাণমন্ডিত, যে খোদার এ কথার ওপর ঈমান রাখে এবং মাঝ পথে আগমনকারী পরীক্ষায় ভয় পায় না। কেননা, পরীক্ষা আসাও আবশ্যক যেন খোদা তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন'।

অতএব খোদার অনুগ্রহে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বৃক্ষ বেড়েছে এবং বেড়ে চলেছে। অন্যএক স্থানে তিনি (আঃ) বলেছেন, 'ছোট শাখাপ্রশাখা এজন্যে হয়ে থাকে যেন আরও উৎকর্ষ সৃষ্টি হয়। অতএব আমাদের কাজ এ বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত থাকা, খোদা আমাদের সাথে আছেন। এ পৃথিবীতে সব সময় সব শহীদের সন্তানসন্ততি আল্লাহ্তাআলা প্রতিপালন করেন।

প্রসঙ্গত এটাও আমি উল্লেখ করছি, রমযানের কিছু দিন আগেই (সম্ভবত এক দেড় মাস আগে) কোয়েটায়ও একটি শহীদের ঘটনা ঘটেছিল। মাঝে মাঝে সেখানে একটা দুটো ঘটনা ঘটেই চলেছে। রমযানের আগে এটা ছিল এক বড় দুর্ঘটনা। তাদের সন্তানদেরও সবাই দোয়ায় স্মরণ রাখবেন। প্রত্যেক জামাতের এটা কর্তব্য, তারা যেন সব শহীদ ও তাদের সন্তানসন্ততিদের দোয়ায় স্মরণ রাখেন। আল্লাহ্তাআলা সবাইকে ধৈর্য ও সাহস দান করুন। ভবিষ্যতে জামাতকে সব অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন'।

বিগত দিনে পাকিস্তানে যে ভূমিকম্প এসেছে এখন আমি এ প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাই। এ ভূমিকম্প, যেভাবে আমি বলেছি, পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলের কোন কোন অংশে এবং কাশ্মীর এলাকায় অধিক ধ্বংস সাধন করে গেছে। জামাতে আহমদীয়ার প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষ হিসেবে এবং মুসলমান হিসেবেও এ ঐশী আপদবিপদে অন্তরে দুঃখ বেদনা অনুভব করেছেন। আর আমরা পাকিস্তানী আহমদী তো নিজেদের ভাইদের দুঃখকষ্ট দেখে অশেষ দুঃখ ও বেদনার মাঝে রয়েছি। দোয়া করছি আল্লাহ্তাআলা আমাদের দেশবাসী ভাইদের দুঃখকষ্ট লাঘব করুন এবং তাদের বিপদ থেকে রক্ষা করুন। আমি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে শোকবার্তা পাঠিয়েছিলাম এতেও তাঁদের নিশ্চয়তা দিয়েছিলাম, জামাতে আহমদীয়া সব সময় যথাসম্ভব তাঁদের সাহায্য করবে। জন্মভূমির প্রতি ভালবাসার এটাই চাহিদা যেন প্রত্যেক পাকিস্তানী আহমদী এ কঠিন সময়ে নিজ ভাইয়ের সাহায্য করে। কার্যকরভাবে আর দোয়ার মাধ্যমেও। নিজেদের দুঃখকষ্ট ভুলে যান এবং অন্যদের কষ্টের প্রতি দৃষ্টি দিন। জামাতে আহমদীয়া প্রথম দিন থেকেই যখন থেকে পাকিস্তান বাস্তবে অস্তিত্ব লাভ করেছে সবসময় পাকিস্তান ও মুসলমানদের অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে কুরবানী করে আসছে। তাই কোন মুসলমান কষ্টে পড়লে বা দেশে কোন বিপদাপদ এলে পাকিস্তানের এক শহরের আহমদী দরজায় দাঁড়িয়ে তামাশা দেখে এবং এ কষ্ট দুর করার চেষ্টা করে না এটা কখনও চিন্তায়ও আসতে পারে না।

একজন আহমদী সবচেয়ে অধিক মানবতার প্রেমে উদ্বুদ্ধ। আমরা এটা দাবি করি, আমরা মানবতার প্রতি অনুগ্রহশীল নবী (সঃ)-এর সবচেয়ে বেশি প্রেমিক। তাই আজ দুখী মানবতা যদি আমাদের আহ্বান করে তাহলে এর সাহায্যে আমাদের এগিয়ে আসা দরকার।

অতএব জামাতে আহমদীয়া এ দেশ সৃষ্টিতেও অংশ নিয়েছে আর ইনশাআল্লাহ্ এর গঠন ও উন্নতির লক্ষ্যে সব সময়ের মত অংশ নিতে থাকবে। কেননা, 'জন্মভূমির প্রতি ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ' (হাদীসের এ বাণীটি) আমাদের সবচেয়ে বেশি স্মরণ করা দরকার। আজ আহমদী মাত্রই জানে জন্মভূমির প্রতি ভালবাসা কি জিনিষ! আর যেসব দেশেই আহমদীরা বসবাস করে তারা নিজ জন্মভূমির প্রতি নিজ দেশের প্রতি আন্তরিক ভালবাসার মূর্ত প্রতীক। তাই পাকিস্তানী আহমদী দেশের প্রতি বিশ্বস্ত নয় কারও মনে যদি এ ধারণা থাকে তাহলে এটা তার খামখেয়ালি।

যদিও এ ভূমিকম্পের পর জরুরী ভিত্তিতেই জামাতের ব্যক্তিবর্গও আর জামাতে আহমদীয়া পাকিস্তানও নিজ দেশবাসীর জন্যে যতটা সামর্থ্যে কুলোয় বিপদক্লিষ্ট লোকদের সাহায্য করার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমি আবারও প্রত্যেক পাকিস্তানী আহমদীর কাছে এটা বলছি, তাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করতে চাচ্ছি, এমন অবস্থায় যখন লক্ষ লক্ষ লোক বাড়ীঘর ছাড়া অবস্থায় রয়েছেন, খোলা আকাশের নিচে পড়ে আছেন যথাসম্ভব তাদের সাহায্য করুন। যেসব পাকিস্তানী আহমদী ভিন দেশে রয়েছেন তাদেরও বেশি বেশি করে এসব লোকদের ত্রাণ কাজে পাকিস্তান সরকারকে সাহায্য করা আবশ্যক। সেখানকার এম্বেসিগুলো যেখানে যেখানে (তহবিল সংগ্রহ করার) ফান্ড খুলেছে এবং যেখানে Humanity First নেই, এসব এম্বেসিগুলোতে গিয়ে সাহায্য দিতে পারেন।

আমাদের দায়িত্বাবলী তো বিভিন্নমুখী। একতো মানুষ হিসেবে, যেভাবে আমি বলেছি, একজন আহমদী সবচেয়ে অধিক মানবতার প্রেমে উদ্বুদ্ধ। আমরা এটা দাবি করি, আমরা মানবতার প্রতি অনুগ্রহশীল নবী (সঃ)-এর সবচেয়ে বেশি প্রেমিক। তাই আজ দুখী মানবতা যদি আমাদের আহ্বান করে তাহলে এর সাহায্যে আমাদের এগিয়ে আসা দরকার। এটা আমি কেবল এজন্যে বলছি না যে, আমি পাকিস্তানী এজন্যে পাকিস্তানকে সাহায্য কর। ইন্দোনেশিয়ায় প্লাবন এসেছে। সেখানেও আমরা সাহায্য করেছি। অন্যান্য স্থানেও এসেছে। সেখানেও সাহায্য করেছি। ইরানেও করেছি। জাপানেও করেছি। অতএব প্রত্যেক স্থানে জামাতে আহমদীরা এ রকম সব সময় করে আসছে। কিন্তু আমাদের মাঝে এখানে যারা বসে আছেন তারা অধিকাংশই পাকিস্তানী। নিজ জন্মভূমির চাহিদা অনুযায়ী তাদের সাহায্য করা আবশ্যক। আর একজন মুসলমান হিসেবে, তারা আমাদের যা মনে করে করুক, আমরা মুসলমানই। আর তারাও আঁ

হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি আরোপিত। তাই মুসলমান হিসেবে আমাদের সাহায্য করা দরকার। জনগণের অধিকাংশ স্বল্প জ্ঞানের কারণে নিজেদের কোন কোন আলেমের কথায় তারা আমাদের বিরোধিতা করে। অথচ এসব লোক আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি আরোপিত হয়ে থাকে। আরোপিত হওয়ার কমপক্ষে দাবী করে থাকে। তারা আজ এ কষ্টে পড়েছে। অতএব আমাদের নিজেদের কষ্টের কথা ভুলে তাদের সাহায্য করা আবশ্যক। আবার পাকিস্তানে আহমদীদের, যেভাবে আমি বলেছি, একজন পাকিস্তানী বাসিন্দা হিসেবেও এটা অবশ্যকর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় যেন এ ঐশী বিপদের কারণে দেশে যে ধ্বংস নেমে এসেছে এর পুনর্বাসনের জন্যে দেশের সাহায্য করে।

ঐশী বিপদ যখন এসে যায় তখন ছোট বড় শিশু বৃদ্ধ গরীব ধনী সবাইকে নিজের কবলে নিয়ে নেয়। দেখুন, খবরে এটাই বলা হয়, কোন কোন শহরে অফিসাররাও, পার্লামেন্টের সদস্যও, রাজনৈতিক নেতাও, স্কুলের ছাত্রও, মহিলারাও, বৃদ্ধরাও সবাই কোন কোন স্থানে ভূমিকম্পের দরুন বাড়ীঘর ধ্বংসের কারণে সময়ের করাল গ্রাসে পরিণত হয়েছে, মারা গেছে। অতএব এটা ছিল বড় একটা ধ্বংস। শহরের পর শহর উৎপাটিত হয়েছে। গ্রামের পর গ্রাম মিশে গেছে। কোন কোনটির তো অস্তিত্বই লোপ পেয়ে গেছে। এখনও কোন কোন স্থানে ত্রাণ কর্মী পৌঁছুতে পারেনি। কিন্তু এর পরও রোজ যে খবারখবর আসছে তা ভয়াবহ দৃশ্য উপস্থাপন করছে। তবুও যেভাবে আমি বলেছি, জামাত কোন কোন স্থানে নিজেদের সাধ্যমত ত্রাণতৎপরতা চালাচ্ছে এবং চালানোও আবশ্যক। কোন কোন স্থানে এমনও রয়েছে যেখানে খোদ্দামুল আহমদীয়ার টিম সবার আগে পৌঁছেছে। সেখানে কোন সরকারী টিম এখনও পৌঁছেনি। সেনাবাহিনীর কোন দল পৌঁছেনি। আর কোন সংগঠন, এন, জি,ও বা অন্য কেউ পৌঁছেনি। অথচ জামাত সেখানে পৌঁছেছে। আর নীরবে কাজ করে যাচ্ছে। কেননা, এর এত প্রোপাগান্ডা বা প্রচারণা হয় না। এরা অধিক হৈ চৈ করে না। উদ্দেশ্য কেবল খেদমতে খালক ও সৃষ্টিসেবা। তাই অনেকেই এসব সেবার খবর পান না। চুপে চুপে যে সেবা তা-ই হয়ে থাকে। কিন্তু কোন কোন আহমদী যেহেতু বারবার ফ্যাক্স পাঠাতে থাকেন এবং পরামর্শও দিতে থাকেন, এটা হওয়া দরকার আর কখনও কখনও অন্যরাও এটা মনে করে, যেহেতু আহমদী চুপচাপ রয়েছে তাই সম্ভবত এসব লোক, পাকিস্তনী আহমদী এ ঐশী বিপদে জাতির সাথে সহানুভূতি প্রদর্শন করছে না এবং দুর্গতদের সাহায্য করছে না। তাই সংক্ষেপে আমি কোন কোন কাজ যা তরিৎভাবে জামাত আরম্ভ করেছে এ প্রসঙ্গে বলে দিচ্ছি ঃ

আমরা আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টির খাতিরে কাজ করি। আমাদের কোন নামের প্রয়োজন নেই। আমরা কারও কাছেই এর প্রতিদান চাই না। কেবল দুঃখী মানবতার সেবা করাই আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

প্রথম কথাতো এটা স্মরণ রাখুন, যেভাবে আমি বলেছি, আমরা আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টির খাতিরে কাজ করি। আমাদের কোন নামের প্রয়োজন নেই। আমরা কারও কাছেই এর প্রতিদান চাই না। কেবল দুঃখী মানবতার সেবা করাই আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি, কোন কোন লোকের স্বস্তির জন্যে সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি, আগেও বলেছি, কোন কোন স্থানে আমাদের টিম সবার আগে পৌছে গেছে। সেখানে প্রথমিকভাবে যা যা সাহায্য করা সম্ভব তা করা হয়েছে। আবার যে অবস্থা ছিল বিপদের পর বিপদ অর্থাৎ ভূমিকম্পের পর প্রবল বর্ষণ এবং শিলা পড়তে আরম্ভ করে। ঘর তো লোকদের ছিলই না। লোকেরা বাইরে ঠান্ডায় পড়ে ছিল। যারা এ বিপদ ও ভূমিকম্প থেকে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল, ঘরচাপা পড়া থেকে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল, ক্ষুধার্তও পিপাসার্ত ছিল। অতএব সেখানে ক্ষুধা ও পিপাসা মিটানোর জন্যে শুকনো রেশন তো কোন কাজেই লাগছিল না। কেননা, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল। আগুন জ্বালানো যাচ্ছিল না। অতএব আমাদের খোদ্দাম ইসলামাবাদ থেকে কয়েক ডেগ খাবার পাক করে নিয়ে গেছে। সেগুলো প্যাকেট তৈরী করে নিয়ে যেতো। কাছাকাছি যেসব এলাকায় তারা যেতে পারতো যেতো সব এলাকা তো তারা শামলাতে পারছিলো না। এক দু'টি গ্রাম যেখানে তারা পৌঁছাতে পারতো পৌঁছতো। আর রোজ দেড় দু' হাজার লোক খাবার খেতে পারছিল। আবার এছাড়াও জামাত থেকে রোজ ২/৩ ট্রাক শুকনো খাবার, কাপড় কম্বল প্রভৃতিও যেতে থাকতো। দেশের অন্যান্য স্থান থেকে যেখানে যেখানে জামাত আছে তারাও রিলিফ ফান্ডে সাহায্য জমা করিয়েছে। ৩ ট্রাক চাউল, ৪ ট্রাক কম্বল, বিছানা, গরম কাপড় ইত্যাদি সিয়ালকোট, শেখুপুরা থেকে গেছে। এর আগে লাহোর প্রভৃতি স্থান থেকেও গেছে। কাল রাবওয়া থেকে এক ট্রাক গরম কাপড় গেছে। সেখানে লাজনা, আনসার, খোদ্দাম সবাই এ কাজে নিয়োজিত। নিজেদের দায়িত্ব উপলব্ধি করছে এবং এ ত্রাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আর বড়ই উত্তম পদ্ধতিতে এ কাজের যোগান দিচ্ছে।

দু'দিন হলো আমি টিভিতে সরকারী কর্মচারী ও রাজনৈতিক নেতার কথাবার্তা শুনেছিলাম। (তারা) বলছিলেন, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে এসব এলাকায় খুবই ঠান্ডা পড়বে। কাশ্মীর এলাকায়তো ঠান্ডা হয়েই থাকে। এজন্যে তরিৎ সেখানে যে

সমস্যা তা হলো বর্ষা। কেননা, বর্তমানে থাকার অবস্থা এমনিতেই তো উপযুক্ত নয়। এজন্যে আমাদের চেষ্টা এটা হওয়া দরকার যেন সেখানে তাদের থাকার সমস্যার সমাধান করা হয়। পরে যেহেতু অসংখ্য লোক মারা গেছে আর তাদের জরুরী ভিত্তিতে দাফন করার ব্যবস্থাও নেই, তাদের কাছে উপরকণ নেই এজন্যে রোগব্যাধি ছড়ানোর বিপদও রয়েছে। অতএব তাঁবু, গরম কাপড় এবং ঔষধপত্র, ডাক্তার ইত্যাদি জরুরী ভিত্তিতে সেখানে যেন যায়।

জামাতের ধারণা ছিল, কোন এলাকা নির্ধারণ করে, যে এলাকাই সরকার জামাতের জন্যে নির্ধারণ করে দেয়, সেখানে একটি তাঁবুর ক্যাম্প বানিয়ে দেয়া হয়। আর জামাত সে লোকদের পুরোপুরি দেখাশুনা করতে থাকে। কমপক্ষে দুই মাসের জন্যে রেশন প্রভৃতি খাবার দাবারও সরবরাহ করে। থাকার প্রত্যেক জিনিষ এবং কাপড় চোপড়ও সরবরাহ করে। এজন্যে যদিও চেষ্টা চলছে। বাকী মালামালের ব্যবস্থা তো ইনশাআল্লাহ্‌তাআলা হয়েই যাবে, বরং হয়েও গেছে। কিন্তু সেখানে তাঁবু পাওয়া যাচ্ছিল না। কেননা, সৈন্যরা এবং অন্যান্য লোক আগে ভাগে নিয়ে নিয়েছিলেন। এখান থেকে হিউম্যানিটি ফার্ষ্ট (ইউ,কে) ৫০০ তাঁবু কিনেছে। এভাবে পাকিস্তানের জামাত ব্যবস্থা করেছে। জাপান থেকে আনা হচ্ছে দেড় হাজার তাঁবু। আল্লাহ্‌তাআলা সে ভাগ্য দিন যেন এসব লোক স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করতে পারেন এবং সব সময়ের মত নিঃস্বার্থভাবে দুঃখী মানবতার সেবা করতে পারেন।

হিউম্যানিটি ফার্স্ট (Humanity First)-এর পক্ষ থেকে ডাক্তারদের একটি দল প্রায় ২০ হাজার পাউন্ড মূল্যের ঔষধপত্রও সাথে নিয়ে গেছে। এতে পাঁচ ডাক্তার এবং প্যারামেডিকস-এর ২ জন অন্তর্ভুক্ত আছেন। জার্মানী থেকে ২ জন ডাক্তারও গেছেন। আর একজন এখান থেকে (U.K) গেছেন। এরা পাকিস্তানে পৌঁছে গেছেন। ডাক্তারদের একটি টিম আমেরিকায় অপেক্ষা করছেন। যখনই তারা ইঙ্গিত পাবেন, ইনশাআল্লাহ্‌ তারা রওয়ানা হয়ে যাবেন। কেননা, পর্যায়ক্রমে যেতে হচ্ছে। হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর মাধ্যমে এখান থেকে কন্টেইনার আজ বা কাল যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত রয়েছে। এতে তাঁবু ও অন্যান্য জিনিসপত্র থাকবে। এখান থেকে যে ডাক্তারগণ গেছেন এখন তাদের কাছ থেকে সংবাদ এসেছে, তারা 'বাগ' নামে একটি স্থানে পৌঁছেছেন এবং কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন। ইনশাআল্লাহ্‌তাআলা, নগদ অর্থ ও আরও জিনিষপত্র হিউম্যানিটি ফার্স্ট সরবরাহ করতে থাকবে। কিন্তু এ কাজ এত বড় আর ধ্বংস এত ব্যাপক এলাকায় সাধিত হয়েছে, যেভাবে আমি বলেছি, ছোট ছোট এন,জি,ও বরং গোটা সরকারী ব্যবস্থাপনাও একে শামলাতে পারে না। এমন বিপদাপদ যখন আসে তখন বড় বড় সরকারও ত্রাণ কাজ করতে সক্ষম হয় না। এখন দেখুন, বিগত দিনগুলোতে আমেরিকায় যে দু'টি ঝড় এসেছিল এর প্রথমটিতে যে ধ্বংস সাধিত হয়েছিল এতে তাদের ধারণা এ শহরের পুনর্বাসন করতে হলে কয়েক বছর লেগে যাবে। অতএব পাকিস্তানের কাছে তো এতটা সামর্থ্যও নেই। খুব কম সামর্থ্য আছে। এর তুলনায় ধ্বংস অতি ব্যাপক এলাকায় ছড়িয়ে গেছে। পুরো জাতি আবেগ ও উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করলে, ঈমানদারীর সাথে সাহায্যের অর্থ পাই পাই করে ত্রাণ কাজে ব্যয় করলেও কয়েক বছর লেগে যাবে।

> আবার জামাতের অনেক কাজ স্বেচ্ছা সেবার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। মানব সেবার আবেগের অধীনে হয়ে থাকে। অন্যদের মাঝে এ আবেগ নেই বললেই চলে।

পাকিস্তানের একটি টি ভি চ্যানেলে আলোচনা হচ্ছিল। কোন এম, এন, এ (পার্লামেন্টের সদস্য) বা অন্য কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব পরামর্শ দিচ্ছিলেন, এম, এন, এ প্রভৃতিদের ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (উন্নয়ন তহবিল) ত্রাণ কাজে ব্যয় করে দেয়া হোক। খুবই সাহায্য হবে। কোন ব্যক্তি বলছিলেন, এখন ঈদ আসছে, ফিতরানার পুরো অর্থ এদের ওপর ব্যয় করা হোক তাহলে অনেক কাজ হয়ে যাবে। এটা তো ঠিক যে, এতে কতটা তো সাহায্য হয়ে যাবে। এটা তো কোন ছোটখাট ধ্বংস নয়। ত্রাণ কাজের জন্যে তো বিরাট অর্থের প্রয়োজন। এখন ফিতরানার কথাই ধরুন না কেন। তার কথায় আমি আনুমানিক হিসেব করেছি। পাকিস্তানে মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি। বলা হয় মাথা প্রতি ফিতরানা হলো ৩০ টাকা করে নির্ধারিত। এতে অনেক অর্থ জমা হয়ে যায়। প্রথমে তো সেখানকার প্রত্যেক শহরবাসী (ফিতরানা) দেয়ই না। অনেক গরীব লোক রয়েছে যারা এটা দেয়ার সামর্থ্যই রাখে না। আর ব্যবস্থাপনাও এমন, পুরো অর্থ একাট্টাও করা যায় না। যুক্তির খাতিরে ধরে নেয়া হলো, সবাই ফিতরানা দিয়ে দিবে। সেক্ষেত্রেও ৪৫০ কোটি টাকাই জমা হতে পারে। অতএব ১৬ হাজার টাকা প্রত্যেক পরিবারের জন্যে ব্যয় করা যেতে পারে। প্রথম তো বলা হয়েছিল ৪০ লাখ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখন বলা হচ্ছে ৫০ লাখ। এখন কেউ অনুমানও করতে পারে না। মারাও গেছে অগণিত লোক। যদি এ সংখ্যা সঠিক বলে ধরা নেয়া হয় তাহলে এর অর্থ হবে কমপক্ষে ৮ লাখ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ হিসেবে প্রায় ২ মাস ধরে তাদের খাদ্য ও পানীয় দিতে হলে এবং তাঁবু সরবরাহ করতে হয় তাহলে প্রায় ১৩০ কোটি টাকার প্রস্তাব। ১৩০ মিলিয়ন পাউন্ড লাগবে কেবল ২ মাস খাওয়াতে। নিজেদের উন্নতি খাতও যদি ব্যয় করা হয় আর সব কিছু ব্যয় করে তাহলেও সম্ভব নয়। আর আমরা যখন অনুমান করি তখন আমরা তো এক এক পয়সা করে ব্যয় করে থাকি। কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকে না। কিন্তু সরকারী কাজকর্মে তো বিপুল পরিমাণ ব্যয় হয়ে থাকে। আবার জামাতের অনেক কাজ স্বেচ্ছা সেবার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। মানব সেবার

আবেগের অধীনে হয়ে থাকে। অন্যদের মাঝে এ আবেগ নেই বল্লেই চলে। আজকাল যদিও কিছুটা আবেগ সৃষ্টি হয়েছে। দেখা যাক কতটা স্থায়ী হয়। তাই যেভাবে আমি বলেছি, এটা কেবল দু' মাসের ব্যয়। যে ধ্বংসলীলা সাধিত হয়েছে, এতে সড়ক, হাসপাতাল, স্কুল ও বিভিন্ন অবকাঠামো মেরামত করতে হবে। আবার লোকদের ঘরবাড়ী রয়েছে, ব্যবসায় রয়েছে, একটা ভয়াবহ অবস্থা এ এলাকায় বিরাজ করছে। এজন্যে তো বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা প্রয়োজন হবে। শ 'শ' কোটি টাকার প্রশ্ন নয়। আল্লাহ্তাআলা কৃপা করুন! ভবিষ্যতে দেশকে প্রত্যেক বিপদাপদ থেকে রক্ষা করুন। এসব লোক আল্লাহ্তাআলার সমীপে বিনত হোক। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ নিজেদের দায়িত্বাবলী উপলব্ধি করুক। আর জনগণের সেবা ও ত্রাণ কার্যে এভাবে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করুক যেভাবে আজকাল দেখানো হচ্ছে। যেভাবে এক রাজনৈতিক নেতা বলেছেন, এ অবস্থায় রাজনৈতিক সুযোগ যেন না নেয়া হয় বরং একাট্টা হয়ে কাজ করুক। আর বাহ্যিকভাবে সাধারণ প্রোগ্রামসমূহে এ দৃশ্য একতাবদ্ধভাবে দৃশ্যমান হয়। আল্লাহ্ করুন এ একতা যেন সব সময়েই প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর এ রীতি স্থায়ীভাবে এমনই করে নিক। এক জাতি হয়ে বিপদগ্রস্ত লোকদের সেবা করুক। রাজনৈতিক বিরোধিতা ও ধর্মীয় ঘৃণাবিদ্বেষের অবসান হোক। মোল্লা একে অপরের প্রতি কুফরী ফতওয়া দেয়া বন্ধ করুক। এথেকে বিরত হোক। বেশি বেশি ইস্তিগফার করুক। যেন আল্লাহ্তাআলা করুণা করে জাতিকে ভবিষ্যত সব রকম বিপদাপদ থেকে সুরক্ষা দান করেন।

এসব অবস্থায় যখন ঐশী বিপদাপদের আশঙ্কা হয় তখন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। তিনি (সঃ) যেভাবে বলেছেন। তাদের রক্ষার জন্যে দোয়ার দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। এগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। আজকাল পাকিস্তানী পত্রপত্রিকায় এসেছে, স্বয়ং তাদের কোন কোন আলেম উলামা এটা মানেন, আল্লাহ্তাআলার পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি এ সতর্কবাণী। অতএব খোদার খাতিরে একে অন্যের প্রতি প্রেমপ্রীতির আচরণ করা আবশ্যক। আর এ সতর্কবাণী হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। আল্লাহ্তাআলার অসন্তুষ্টি থেকে সব সময় আশ্রয় চাওয়া উচিত।

> হে আল্লাহ্! আমি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে তোমার সন্তুষ্টির আশ্রয়ে আস্‌ছি। আমি কেবল তোমারই আশ্রয় চাচ্ছি। আমি তোমার প্রশংসা গণনা করতে অক্ষম। নিঃসন্দেহে তুমি এমনই যেভাবে তুমি স্বয়ং তোমার প্রশংসা করেছো

তিনি (সঃ) একটি হাদীসে আমাদের এ একটি দোয়া শিখিয়েছেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে তোমার সন্তুষ্টির আশ্রয়ে আস্‌ছি। আমি কেবল তোমারই আশ্রয় চাচ্ছি। আমি তোমার প্রশংসা গণনা করতে অক্ষম। নিঃসন্দেহে তুমি এমনই যেভাবে তুমি স্বয়ং তোমার প্রশংসা করেছো (ইবনে মাজাহ্, কিতাবু ইকামাতিস্ সলাহ্)।

অতএব আল্লাহ্তআলার সন্তুষ্টির আশ্রয় ও আল্লাহ্‌র ক্ষমার আশ্রয়ে আসার জন্যে নিজেকে নিজের পরিবর্তন করা আবশ্যক। রাজনৈতিক নেতা, আলেম উলামা এবং জনসাধারণেরও পরস্পর ঘৃণাবিদ্বেষ ব্যথাবেদনা এবং শত্রুতা ছড়ানো, একে অপরকে কুফরী ফতওয়া দেয়া বন্ধ করতে হবে। আমরা আহমদীরা সহানুভূতির আবেগ নিয়ে দোয়া করছি, যেভাবে আজ গোটা জাতি বাহ্যিকভাবে এ বিপদের দরুন ঐক্যবদ্ধ হয়েছে সব সময় যেন ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং আল্লাহ্‌র ভয় তাদের প্রাণে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের তো এ অবস্থা ছিল, বৃষ্টি ও মেঘ দেখেও তাঁর (সঃ) আশ্চর্য অবস্থা হয়ে যেত। একটি বর্ণনায় এর উল্লেখ এসেছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া ওয়া সাল্লাম যখন ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখতেন তখন তাঁর (সঃ) চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যেতো। [তিনি (রাঃ)] বলেন, একদিন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) লোকেরা তো মেঘ দেখে বৃষ্টি হবে বলে আনন্দিত হয়। কিন্তু আমি দেখি, আপনি মেঘ দেখলে অস্থির হয়ে যান (এর কারণ কি)? তিনি (সঃ) বল্লেন, **হে আয়েশা! কে জানে এ ঝড়েও হয়তো তেমনই কোন আযাব লুকায়িত আছে যাতে একটি জাতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।' আর এমন একটি জাতি গত হয়ে গেছে যারা আযাব দেখে বলেছিল, এটা তো মেঘ। বর্ষণ করে সরে যাবে। কিন্তু সেই মেঘই তাদের ওপর কষ্টদায়ক আযাবে পরিণত হয়ে বর্ষিত হয়েছে** (বুখারী, কিতাবুত তফসীর, সূরা আল্ আহকাফ)।

অতএব আমরা মুসলমান হিসেবে যে কোন ফিরকার সাথে সম্পর্কিত লোক হই না কেন সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেছি, সেই উত্তম আদর্শ (সঃ)-কে সব সময় দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক। আর সব সময় আল্লাহ্তআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। তাঁর আশ্রয়ের ছায়াতলে আসার চেষ্টা করা দরকার।

আর একটি বর্ণনায় এসেছে। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এমন একটা দোয়ার উল্লেখ করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর বর্ণনা করেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যখন মেঘ ও বিদ্যুৎচমক দেখতেন এবং বজ্রধ্বনি শুনতেন তখন এ দোয়া করতেন–**আল্লাহুম্মা লা তাক্বতুলনা বি গাযাবিকা ওয়ালা তুহলিকনা বি 'আযাবিকা ওয়া 'আফিনা ক্বাবলা যালিকা** অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি তোমার ক্রোধ দিয়ে আমাদের হত্যা করো না এবং তোমার আযাব দিয়ে আমাদের বিনাশ করো না। এর আগেই আমাদের রক্ষা করে নাও (তিরমিযী, কিতাবুদ্ দা'ওয়াত)।

আবার একটি বর্ণনায় এভাবে উল্লেখ এসেছেঃ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখনই কোন ধূলিঝড় হতো তখন রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ দোয়া করতেন, **আল্লাহুম্মা ইন্নী আসায়লুকা খয়রাহা ওয়া খয়রা মা ফীহা ওয়া খয়রা মা উরাসিলাত বিহী ওয়া আ'উযুবি মিন শার্‌রিহা ওয়া শার্‌রি মা ফীহা ওয়া শার্‌রি মা উরসিলাত বিহী** অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে এ ধূলিঝড়ের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ মঙ্গল ও কল্যাণ চাচ্ছি। আর সেই মঙ্গলও চাচ্ছি যা নিয়ে এ পাঠানো হয়েছে। আর এর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অনিষ্ট থেকে এবং সেই অনিষ্ট থেকেও আশ্রয় চাচ্ছি যা নিয়ে এ পাঠানো হয়েছে (মুসলিম, কিতাবুস্ সালাতুল ইসতিসক্বাহ্)।

তাঁর (সঃ) আর একটি দোয়া আছে ঃ

আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন যওয়ালি নি'মাতিকা ওয়া তাহাব্বুলি 'আফিয়াতিকা ওয়া ফুজায়াতি নিক্ব্‌- মাতিকা ওয়া জামি'ঈ সখাত্বিকা অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি তোমার পুরস্কার বিনষ্ট হওয়া থেকে, তোমার পক্ষ থেকে আপতিত বিপদাপদ মিটে যাওয়ার জন্যে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তি থেকে আর সেসব বিষয় থেকে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি যাতে তুমি অসন্তুষ্ট হও (মুসলিম, কিতাবুয যিক্‌র)। আবার আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের একটি দোয়া এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

আ'উযুবি ওয়াজহিল্লাহিল 'আযিমিল্লাযী লায়সা শায়উন আ'যামু মিনহু ওয়া বি কালিমাতিল্লাহিত্তাম্মাতিল্লাহি লা ইউজাবিযুহুন্না বার্‌রাঁওয়ালা ফাজিরাঁওওয়া বি আসমায়িল্লাহিল হুসনা মা 'আলিমতু মিনহু ওয়া মা লাম আ'লামু মিন শার্‌রি মা খলাক্বা ওয়া যারায়া ওয়া বারায়া –অর্থাৎ আমি আমার মহামহিম আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাচ্ছি। তাঁর চেয়ে মহান সত্তা আর কেউ নেই। আর সেসব পরম পরিপূর্ণ কথারও আশ্রয় চাচ্ছি কোন পুণ্যবান বা পাপী যে কথাগুলো এড়িয়ে যেতে পারে না। আর আল্লাহ্‌র সব গুণ যা আমার জানা আছে আর যা জানা নেই এর সবার আশ্রয় চাচ্ছি। তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং বিস্তার করেছেন এথেকে আশ্রয় চাচ্ছি। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, কিতাবুল জাম'ই)।

অতএব এটা সুন্নত বা রীতি। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এটাই বলে গেছেন। আর এ যুগ এমনই। সব আহমদীদের অধিক সংখ্যায় এসব দোয়া করতে থাকা উচিত এবং বিপুল সংখ্যায় ইস্তিগফারও করা আবশ্যক।

১০০ বছর আগে ১৯০৫ সনে যখন কাঙ্গরাতে ভূমিকম্প এসেছিল তখন কাদিয়ানেও এর ঝাপ্টা লেগেছিল। সে সময়ে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) সম্বন্ধে বর্ণনায় এসেছে, তিনি সব গৃহবাসী ও বন্ধুদের নিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত নফল নামায, দোয়া এবং রুকূ ও সিজদাতে ব্যাপৃত ছিলেন। আবার বর্ণনায় এসেছে, তিনি (আঃ) আল্লাহ্‌তাআলার বেপরওয়া হওয়া ও ভ্রূক্ষেপহীনতার ব্যাপারে খুবই ভীত ও কম্পমান ছিলেন। খুবই ভয়ের অবস্থা ছিল। ভীতিবিহ্বল অবস্থা বিরাজমান ছিল। আবার বলা হয়ে থাকে, সে সময়ও কিছুক্ষণ পর পর ভূমিকম্পের ঝাপ্টা অনুভূত হচ্ছিল। তাই তাঁর (সঃ) সব ভক্ত ও শীষ্যদের তেতলা দালানে থাকা সমীচীন মনে করলেন না। কাদিয়ানে তাঁর (আঃ) যে বাগান ছিল সেখানে চলে গিয়েছিলেন। আর তাঁবু খাটিয়ে সেখানে অবস্থান করছিলেন। অতএব এ কথাটাও সব আহমদীর দৃষ্টিপটে রাখা দরকার, প্রত্যেক বিপদাপদেই নিজেকে বিশেষভাবে সুরক্ষা করার জন্যে এবং জাতিকেও সুরক্ষা দেয়ার জন্যে দোয়া করা উচিত। আর এসব দোয়ায় এবং এসব সিজদায় নিশ্চয় হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-ও নিজের জাতির জন্যও দোয়া করে থাকবেন। বরং জাতির জন্যেই দোয়া করে থাকবেন যেন আল্লাহ্‌তাআলা এ আযাব থেকে রক্ষা করেন। এজন্যে প্রত্যেক আহমদীর এ বিপদ থেকে সুরক্ষার দোয়া করা উচিত। এর অনিষ্ট থেকে সুরক্ষার জন্যে দোয়া করা উচিত। রেওয়ায়েতের মাধ্যমে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যেসব দোয়ার সম্বন্ধে আমরা জানতে পেরেছি তা-ও করা উচিত এবং নিজ ভাষায়ও করা উচিত। নিজ জাতির জন্যও দোয়া করা উচিত। যেভাবে আমি বলেছি, আল্লহ্‌তাআলা তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) এমন অবস্থায় আমাদের দোয়া করার যে পদ্ধতি শিখিয়েছেন তা সব সময় দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক।

তিনি (আঃ) বলেছেন ঃ 'জামাতের সব লোকের উচিত' সেই সময়ের ভূমিকম্পের অবস্থার প্রেক্ষিতে এ দোয়ার কথা তিনি বলেছেন, নিজের অবস্থা শুধরে নিন। তওবা ও ইস্তিগফার করুন। সব রকম সংশয়সন্দেহ পরিহার করুন। নিজ অন্তরকে নির্মল ও স্বচ্ছ করুন। দোয়ায় নিয়োজিত হোন। এমনভাবে দোয়া করুন যেন মরেই গেছেন। খোদা যেন নিজ ক্রোধের কারণে মৃত্যুর ধ্বংস থেকে তাদের রক্ষা করেন। বনী ইসরাঈল যখন পাপ করছিলো তখন আদেশ দেয়া হতো, নিজেরা নিজেদের হত্যা কর। এ কৃপাপ্রাপ্ত উম্মতের ওপর থেকে এ আদেশ রহিত করা হয়েছে। এর পরিবর্তে এখন দোয়া এমনভাবে করতে বলা হয়েছে যেন নিজেকে নিজে হত্যা করে ফেলেছে।'

আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সব সময় দোয়ার এ মান ও স্তর লাভ করার সৌভাগ্য দান করুন। এখন রমযানের কল্যাণমন্ডিত মাসও অতিবাহিত হচ্ছে। আর এতে দোয়ার কবুলিয়তেরও বিশেষ সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। আল্লাহ্‌তাআলা এ মাস দান করেছেন। তাই এসব দিনে বিশেষ করে দুনিয়ার সঠিক পথনির্দেশনা লাভের জন্যে এবং ধ্বংস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে প্রত্যেক আহমদীর দোয়া করা উচিত। সব রকম বিপদাপদ থেকে সুরক্ষার জন্যে দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্‌তাআলা সবাইকে দোয়া করার সৌভাগ্যও দান করুন আর কেবল নিজ অনুগ্রহে এসব দোয়া কবুলও করুন।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনালের ৪-১০ নভেম্বর, ২০০৫ তারিখের সংখ্যার সৌজন্যে)

অনুবাদ–আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

নবী করীম (সঃ)-এর মাধ্যমে উম্মতে মুসলিমা প্রতিষ্ঠিত

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহেঃ) প্রদত্ত খুতবা ৯ জুন ১৯৬৭

খুতবা জুমুআ
স্থান ঃ মসজিদ মুবারক, রাবওয়া

* নিজের যাবতীয় ইচ্ছা ও আশা-আকাঙ্খা পরিত্যাগ করে খোদার সন্তুষ্টিতে পরিতৃপ্ত থাকতে সর্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত।

* প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী শান্তি ও নিরাপত্তার স্তরসমূহ দৃঢ়ভাবে সমুন্নত রাখতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো।

* তওবা ও ইস্তেগফার ব্যতীত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করা ও ঐশী সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব নয়।

* কুরআন করীম স্থান কাল ও পাত্র অনুযায়ী উপকারী কর্ম ও হিত সাধনের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

* নিজেদের প্রচেষ্টা, সাধনা ও কুরবানীসমূহকে কখনই অপূর্ণতামুক্ত, নির্দোষ ও পবিত্র মনে করো না।

তাশাহ্হুদ তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা তেলাওয়াতের পর হুযূর (রাহেঃ) নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করেন।

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

(আল বাকারা ঃ ১২৯,১৩০)

অতঃপর হুযূর (রাহেঃ) বলেন ঃ-

পবিত্র কাবাগৃহ বিনির্মাণের ১৯ (উনিশ) টি মহান উদ্দেশ্যের বিষয়ে আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি। বিশতম উদ্দেশ্য ওয়া মিন জুররিইয়াতিনা উম্মাতাম মুসলিমাতাল্ লাক-এ বর্ণিত হয়েছে আর প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যে প্রতিশ্রুত 'হাদীয়ে আলাম' বিশ্ব জগতের পথ প্রদর্শক (সঃ)-এর আধ্যাত্মিক প্রভাব ও পবিত্রকরণ শক্তির কারণে জগতের জাতিসমূহের মাঝে বিদ্যমান স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন অন্তঃকরণের অধিকারী আত্মাগুলো প্রকৃতই 'উম্মতে মুসলিমা'-য় পরিণত হয়ে যাবে। আরবীয়রা রসূল (সঃ) এর সম্বোধিতদের মধ্যে প্রথম, তাদের সকল দোষ ত্রুটি অপবিত্রতা ধুয়ে মুছে পরিস্কার করা হবে। এভাবে তারা পাক পবিত্র হয়ে আঁ হযরত (সঃ)-এর শাফায়াতের ছায়াতলে আশ্রয় পেয়ে নিজেদের মহান স্রষ্টা ও আসল মালিকের দরবারে সমবেত হবে এবং জগতের 'পথ-প্রদর্শক' হয়ে রসুল (সঃ)-এর উত্তম আদর্শ পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া ও এর অন্ত র্নিহিত ভবিষ্যদ্বাণী যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও পাওয়া যেত তদনুযায়ী আল্লাহ্তাআলা নবী আকরাম (সঃ) এর মাধ্যমে এক উম্মতে মুসলিমা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যেমনটি কুরআন করীমে সূরা হজ্জে বর্ণিত হয়েছে ঃ
(সূরাতুল হজ্জ ঃ ৭৯)

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

এখানে আল্লাহ্তাআলা বলেন যে, তোমার যাবতীয় শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে সকল বোধ ও বুদ্ধির দ্বারা আল্লাহ্তাআলার পথে জিহাদ কর-সংগ্রাম কর। এই সাধ্য-সাধনা ও প্রচেষ্টাকে চূড়ান্ত মার্গে পৌছাও তার হক্বকে পুরা কর কেননা তিনি বাছাই করে তোমাদের মনোনীত করেছেন। তোমাদেরকে ধার্মিকতাপূর্ণ সম্মান দান করেছেন আর তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ ধর্ম-বিধান দিয়েছেন। তোমাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট নির্দেশাবলী অবতীর্ণ করেছেন। ওই নির্দেশাবলী অনুসরণের জন্য যে শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন, উক্ত নির্দেশাবলীর সাথে তা-ও তোমাদের প্রদান করা হয়েছে। এজন্য উক্ত নির্দেশাবলী পালন করা তোমাদের জন্য কোন বোঝা নয়। তোমরা, হে পিতা ইব্রাহীমের বংশধরেরা! আল্লাহ্ তোমাদেরকে 'আল মুসলেমীন' নাম দিয়েছেন, উম্মতে মুসলেমা আখ্যায়িত করেছেন। তোমাদের ব্যাপারে পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থেও এই নাম ব্যবহৃত হয়ে আসছে আর কুরআন করীমও তোমাদেরকে উম্মাতাম মুসলিমা, 'আল মুসলেমীন' নামে স্মরণ করে থাকে। এই নাম প্রাপ্তি ওই দোয়া সমূহের জন্যই হয়েছে যা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) করেছিলেন। সেই কল্যাণকর ও কল্যাণকামী ও কল্যাণ প্রদায়ী রসূলের আবির্ভাবের সাথে দুনিয়াতে এক উম্মতে মুসলিমা প্রতিষ্ঠিত করা হোক এবং তার বংশধরেরাও উম্মতে মুসলিমায় অন্তর্ভুক্ত হোক। অতএব, পবিত্র কাবাগৃহের সাথে সম্পর্কিত যে আয়াতসমূহ রয়েছে তার মধ্যে ওয়া মিন জুররিইয়াতি উম্মাতাম মুসলিমাতাল্ লাক-এর দোয়াটি রয়েছে। কুরআন করীমের সূরা হজ্জের ওই আয়াত এই দাবী রাখছে যে ওই দোয়া গৃহীত হয়েছে আর যে ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থাদিতে বর্ণিত হয়েছে সেই সব পূর্ণ হওয়ার সময়ও এসে গিয়েছে। আঁ হযরত (সঃ) আবির্ভূত হয়ে গিয়েছেন আর উম্মতে মুসলিমাও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। এজন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে মানুষের অভ্যন্তরের আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক গুণাবলীতে, চিন্তা ও চেতনায় বুদ্ধি ও বোধনে অভাবনীয় যে সম্ভাবনা সুপ্ত রয়েছে তা প্রকাশের যুগ এসে গিয়েছে। এখন জগত দেখবে যে, মানুষ তার প্রভু প্রতিপালকের রাস্তায় নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য কীভাবে ব্যয় করে! আর চিন্তা চেতনাকে উৎকর্ষতার পরম মার্গে কীভাবে তারা পৌঁছায়!

ইসলামের অর্থ হল নিজেকে উৎসর্গ করতে আল্লাহ্তাআলার সামনে, নিজের প্রভূ-প্রতিপালকের সামনে নিজের ঘাড় পেতে রাখা। নিজের সকল আশা আকাঙ্খা পরিত্যাগ করে সকল ইচ্ছা ও চাওয়া পাওয়া ছেড়ে-ছুঁড়ে দিয়ে খোদার ইচ্ছার অধীনে সন্তুষ্ট থাকতে

সারাক্ষণ প্রস্তুত থাকা অর্থাৎ নিজের বলে কিছুই যেন আর অবশিষ্ট না থাকে, সবকিছুই খোদাকে দিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর খোদা থেকে এক নব জীবন লাভ করে–এক 'খায়রে উম্মত' রূপে ইহজগতে জীবন কাটায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এই প্রসঙ্গে বলেন ঃ

'ইসলাম'এর পরিভাষাগত অর্থ হল ও-ই, যা এই আয়াতে করীমায় ইশারা করা হয়েছে বালা মান আসলামা ওয়াযহাহু লিল্লাহি ওয়া হুওয়া মুহসেনুন ফালাহু আজরুহু ইনদা রাব্বিহী ওয়ালা খাওফুন আলাইহিম ওয়ালাহুম ইয়াহযানুন (আল বাক্বারা ঃ ১১৩) অর্থাৎ সে-ই মুসলমান যে খোদাতাআলার পথে নিজের সমস্ত সত্তাকে পরিপূর্ণরূপে সমর্পণ করে দেয়। অর্থাৎ সে নিজ সত্তাকে আল্লাহ্তাআলার জন্য নিবেদন করে রাখে, তাঁর ইচ্ছার অনুসরণ করতে তাঁর সন্তুষ্টিকে অর্জন করতে নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়। খোদাতাআলাকে লাভ করার জন্য সৎকাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। নিজস্ব সকল শক্তি ও কর্মক্ষমতাকে তাঁরই পথে নিয়োজিত করে রাখে। উদ্দেশ্য হলো–ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে আর কর্মের দিক থেকেও খোদাতাআলারই হয়ে যাওয়া। ধর্মবিশ্বাসের বেলায় এমন যে সে নিজের সম্পূর্ণ অস্তিত্বকে বাস্তবিকভাবে এমন এক জিনিষ ভেবে নেয় যা খোদাতাআলাকে শনাক্ত করতে পারে তাঁর আনুগত্য করে, তাঁর প্রেম ও ভালবাসা আর তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর কর্মের দিক থেকে এমন যে, শুধুই আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে প্রকৃত সৎকাজ যা প্রতিটি কর্মোদ্দীপনা ও কর্মশক্তির ব্যাপারে খোদা প্রদত্ত প্রত্যেক সামর্থ্যের সাথে সম্পৃক্ত তা সাধন করতে সদা তৎপর থাকে। কিন্তু এতই আনন্দে বিভোর হয়ে আগ্রহ ও বিনয়ের সাথে কর্ম সম্পাদন করতে থাকে যে সে নিজের আনুগত্যের আয়নায় নিজের প্রকৃত মা'বুদের চেহারা দর্শন করতে থাকে।

(আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন ৫ম খন্ড, পৃঃ ৫৮)

একুশতম উদ্দেশ্য 'আরেনা মানাসেকানা'–তে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে সেই প্রতিশ্রুত নবীর উপর এমন এক শরীয়ত অবতীর্ণ হবে যা মানব-প্রকৃতির সকল বাস্তব সম্মত চাহিদা পূরণকারী হবে, সকল চিন্তা চেতনা তাথেকে কল্যাণ লাভ করবে। কলুষমুক্ত প্রত্যেক স্বভাবজাত অবস্থা নিজ বৈশিষ্ট অনুসারে স্থান কাল পাত্র অনুযায়ী তা থেকে নির্দেশনা গ্রহণ করে উপকৃত হবে। প্রত্যেক যুগের চাহিদা, প্রত্যেক জাতির চাহিদা, প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্ত াচেতনা অনুযায়ী তার চাহিদা এর শিক্ষায় এর নীতিমালায় বিদ্যমান থাকবে আর তা বহালও রইবে। আল মানাসেক, আল মানসাক ও আল মানসেক'-এর বহুবচন (সমষ্টিবাচক বিশেষ্য)। এর অর্থ হল যুহদ ও ইবাদত। যুহদ অর্থাৎ ধার্মিকতা, সংসারের প্রতি উদাসীনতা, ইবাদত অর্থাৎ ভক্তি-উপাসনা অর্থাৎ ওই সব কাজ যা আল্লাহ্তাআলার নৈকট্য লাভের জন্য করা হয়ে থাকে।

এখানে আল্লাহ্তাআলা এটা বলেননি যে, 'আরেনাল মানাসেক' ইবাদতের পরিপূর্ণ পদ্ধতি আমাদের শেখাও বরং এটা বলেছেন যে আরেনা মানাসেকানা আমাদের অবস্থানুযায়ী ইবাদতের যে সঠিক পদ্ধতি রয়েছে তা আমাদের শেখাও। মনে রাখা দরকার যে, কেবল 'কুরআনী শরীয়ত'ই এমন যেখানটায় এই ব্যবস্থা বিদ্যমান, পূর্ববর্তী ধর্মীয় বিধানসমূহে অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল না। যখন উম্মতে মুসলিমার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল আর কুরআন করীমের শরীয়ত তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়ে গেল, তখন ইব্রাহীম (আঃ)-এর আরেনা মানাসেকানা-এর দোয়া কবুল হল। অতএব, আরেনা মানাসেকানা-তে এই দোয়া করা হয়েছিল যে হুকুকুল্লাহ্ ও হুকুকুল ইবাদ অর্থাৎ আল্লাহ্র হক ও বান্দার হক পূরণে, স্থান কাল পাত্র অনুযায়ী উৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বনের সামর্থ্য দান কর। কুরআন করীম এই কথার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষার বিভিন্ন আঙ্গিক রয়েছে অর্থাৎ প্রতিটি নির্দেশনার বিভিন্ন দিক রয়েছে। যে দিকনির্দেশনা কুরআন করীম প্রদান করে তার যে আঙ্গিকটি স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেচনা প্রসূত হয় তদনুযায়ী কর্মপন্থা অবলম্বন কর ও ব্যবস্থা নাও। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন যে, কতিপয় ব্যক্তি ইবাদতের ক্ষেত্রে সাধ্য-সাধনা করতে গিয়ে নিজের চিন্তা-চেতনা ও সামর্থ্যের 'উর্ধ্ব সীমা' অতিক্রম করে ফেলে, দীর্ঘ দিন ধরে রোযা রাখে, নিদ্রা ও বিশ্রাম খুবই কম করে, এমন হয় যে তাদের শারিরীক অবস্থা সহনীয়-ক্ষমতার বাহিরে চলে যায় এতে তাদের পরিণাম আল্লাহ্তাআলার নৈকট্য লাভের পরিবর্তে বরং তারা পাগলে পরিণত হয়। তাদের কারও কারও অনভিপ্রেত নানা রোগ দেখা দেয়, জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে পুষ্টিহীনতায় ভূগে, যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয় এমনি আরো নানা রোগ ব্যাধি তাদের নিত্য সাথী হয়ে যায়।

এখানে এই দোয়া শেখানো হয়েছে যে 'ওয়া আরেনা মানাসেকানা'–প্রত্যেক যুগের জাতিসমূহের জন্য, প্রত্যেক জাতির জন্য বিভিন্ন যুগের ধারায়, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের প্রেক্ষিতে যথোপযুক্ত ইবাদত (উপাসনা) আর হুকুকুল্লাহ (আল্লাহ্র উপাসনা) ও হুকুকুল ইবাদ (সৃষ্টির সেবা)-এর দাবী পূরণের সঠিক পন্থা অবলম্বনের শিক্ষা আমাদের দাও যাতে আমরা সর্বপ্রকার রোগ-ব্যধি থেকে, দূর্বলতা ও নির্বুদ্ধিতা থেকে, পদস্খলন ও পথভ্রষ্টতা থেকে, ভীরুতা ও কাপুরুষতা থেকে রক্ষা পেয়ে তোমার নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হই।

'আহসান' এর প্রতি অর্থাৎ যা উৎকৃষ্ট পন্থা তা কার্যকর করতে কুরআন করীম অত্যন্ত জোরালো ভাবে বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যেমন বলা হয়েছে 'জাদেলহুম বিল্লাতী হে ইয়া আহসানু' (আন্ নাহ্‌ল-১২৬) অন্যের সাথে বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের ক্ষেত্রে তোমরা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে পার। তবে যেটা 'আহসান'-উৎকৃষ্ট পন্থা সেটাই অবলম্বন কর। একজন, যে ভালবাসার সাথে বললে মানতে প্রস্তুত তাকে তুমি ভয় প্রদর্শন কর না। এমন পরিস্থিতিও এসে যায় যে বিরুদ্ধবাদী ভাবে আমি ষড়যন্ত্র করে যদি তাকে ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত করে দিতে পারতাম, তবে তার ক্ষতি হতো আর আমার হতো লাভ। ওই সময়ে একজন আহ্‌মদীর অবশ্য কর্তব্য যে কুরআন করীম প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী শান্তি ও নিরাপত্তার মানদ সমুন্নত রাখতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা আর জাদেলহুম বিল্লাতি হে ইয়া আহসানু-তে যে আহসান-উৎকৃষ্ট পন্থা গ্রহণ করার আদেশ রয়েছে তা পালনকারী হয়, যাতে শান্তি ও নিরাপত্তায় প্রতিবন্ধকতা বা বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়। কুরআন করীম প্রদত্ত বহুবিধ নির্দেশসমূহে আল্লাহ্তাআলা এই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, কোন নির্দেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিবিধ পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে তবে যেটা উৎকৃষ্ট পন্থা তা অবলম্বন কর। আল্লাহ্তাআলা নীতি নির্ধারন করে দিয়েছেন যে 'ওয়াত্তাবেউ আহসানু মা উনযিলা ইলাইকুম্ মির্ রাব্বেকুম (আয্ যুমার-৫৬)। পরিপূর্ণ ও পূর্ণতাদানকারী বিধি ব্যবস্থা 'কুরআন করীম'-এ তোমাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে আর তোমাদের এই আদেশ করা হয়েছে যে 'ওয়াত্তাবেউ আহসানু মা উনযিলা ইলাইকুম্ মির্ রাব্বেকুম (আয্ যুমার-৫৬)। তোমাদের প্রভু প্রতিপালক যিনি তোমাদের প্রতিপালন করে চূড়ান্ত মার্গে উন্নীত করতে চান। নিজের ওই বিশেষ গুণের কারণেই তিঁনি এমন এক শরীয়ত (বিধিবিধান) অবতীর্ণ করেছেন যার বহুবিধ দিক ও দিগন্ত রয়েছে। প্রতি জন প্রতি ব্যক্তি, প্রতি জাতি ও প্রত্যেক কাল ও মহাকালে এটা প্রতিপালনের দাবী এই-ই যে, নানা দিক-ও দিগন্তে বিভিন্ন ধারায় আদেশ-

নির্দেশ সমূহ কার্যকর করার পন্থা এতে বিদ্যমান রয়েছে। এই শরীয়ত বা বিধি-বিধান পরমদাতা প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত তাই কিয়ামতকাল পর্যন্ত এটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত। যেটি উৎকৃষ্ট পন্থা সেটি তোমরা অবলম্বন কর আর পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রতিটি নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে তোমাদের বিবেচনায় সম্ভাব্য উৎকৃষ্ট পন্থাটি তোমরা অবলম্বন কর যা যুগ ও সময় উপযোগী হয়। যার ফলে তোমাদের সুপ্ত শক্তি ও প্রতিভা আর চিন্তা-চেতনা ও মেধা পরিপুষ্টি ও ক্রমোন্নতি লাভ করতে পারে।

অনুরূপভাবে, আল্লাহ্‌তাআলা অন্য এক আয়াতে নির্দেশ করেছেন 'ফাবাশ্‌ শের্ ইবাদিল্লাযী ইয়াস তামেউনাত্ তাকুলু ফাত্ তাবেউনা আহসানু (আয্ যুমার-৮,৯) অর্থাৎ আমার এই বান্দাদের অনুগতদের মধ্যে যারা 'আল্ কাওল' এই উত্তম শরীয়ত এই মঙ্গলজনক বিধি-বিধান মেনে চলে 'ফাত্তাবেউনা আহসানাহ' নির্দেশনায় যে আদেশাবলী তাকে দেয়া হয় ওর মধ্যে উৎকৃষ্টতমটির অনুবর্তিতা করে তাদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও 'উলায়েকাল্লাযিনা হাদাহুমুল্লাহ' (আয্ যুমার-১৯) অর্থাৎ আল্লাহ্‌তাআলা তাদের হেদায়াতের পথ প্রদর্শনের উপকরণ যোগাবেন আর আল্লাহ্‌তাআলার দৃষ্টিতে এই লোকেরাই 'উলুল আলবাব' (আয্ যুমার ঃ ১৫) সাব্যস্ত হবে, শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিপন্ন হবে। এখানে বলা হয়েছে যে আল্লাহ্‌তাআলা মানুষকে উলুল আলবাবের (দূরদৃষ্টি প্রাপ্তদের) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন আর জ্ঞান-বুদ্ধি এজন্য দিয়েছেন যে সে ইসলামের বিধিবদ্ধ নির্দেশাবলীর আয়ত্ত্বাধীনে তার জ্ঞান-বুদ্ধি পরিচালিত ও প্রয়োগ করবে। সে যেন নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধি কাজে লাগায় আর পরিবেশ পরিস্থিতি দৃষ্টিপটে রাখে। যেমন যদি কেউ কারও সাথে ভিন্ন মত পোষণ করে তবে তার মনস্তাত্তিক (চংুপযড়ষড়মু) অবস্থা নিরীক্ষণ করে সে যেন নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, আমি এই কথা এভাবে বললে আমার সম্বোধিত ব্যক্তির উপর আমার কথা প্রভাব বিস্তার করবে।

এখানে বিস্তারিতভাবে আল্লাহ্‌র এমন অনুগতদের জন্যই সুসংবাদ দান করা হয়েছে যারা কুরআন করীমের বিধি-বিধান মান্য করে কর্ম ও জীবন অতিবাহিত করে। সুসংবাদ ওইসব লোকদের জন্য নয় যারা কুরআন করীম তো শুনে কিন্তু নিজেদের বিচার-বুদ্ধি কাজে লাগায় না আর 'আহসান'-উত্তম পন্থার পরিবর্তে ভিন্ন কোন উপায় অবলম্বন করে। তাই এরূপ উপাসনাকারীদের জন্য আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন করীমে হেদায়াতের-পথ প্রদর্শনের সুসংবাদ প্রদান করেন নাই বা শুভ-পরিণাম লাভের সুসংবাদবহ বার্তাও দেন নাই। এখানে এক অর্থ এই হবে যে আমার ওইসব উপাসনাকারীরা যারা 'আল কওল' শুনে থাকে আর তাথেকে 'আহসান' এর অনুবর্ত্তিতা করতে থাকে তাদের শুভ-পরিণাম লাভ হবে, যারা তা করে না তাদের পরিণাম শুভ হবে না।

বাইশতম উদ্দেশ্য 'তুব্ আলাইনা'-তে বর্ণিত হয়েছে আর তাতে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, শেষ 'শরীয়ত'-বিধিবিধান যা এখানে প্রেরিত হবে তার গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক থাকবে 'রাব্বে তাওয়াব'- তওবা কবুলকারী রব-প্রত্যাবর্তনকারীর প্রত্যাবর্তন গ্রহণকারী প্রভু-প্রতিপালকের সাথে। আর এর আজ্ঞাবহরা ও এর অনুসারীরা এই মৌলিক নীতির তাৎপর্য বুঝে যাবে যে তওবা ও ইস্তেগফার ব্যতীত মারেফতে ইলাহী-আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান ও ঐশী সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব নয়। অতএব তাঁর পথে বারবার যেভাবে সে কুরবানী দিতে থাকবে তেমনিভাবে প্রতিনিয়ত ইস্তেগফারের মাধ্যমে তাঁর থেকে বর্ধিত শক্তি ও সামর্থ্য অর্জন করতে থাকবে এবং তওবার সাথে সাথে তাঁর প্রতি বিনয়াবনতও হতে থাকবে। স্বীয় সাধ্য-সাধনা, চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগকে কখনই নিস্কলুষ ও নিরাপদ ভাববে না।

'তাবাল্লাহু আলাইহে' এর অর্থ 'তাওবাতুহু' এক উপাসনাকারী সৃষ্টি করলেন যে তওবা করে আর তিঁনি তার তওবা কবুল করে নিলেন। এখানে এই দোয়া রয়েছে যে, 'ওয়া তুব্ আলাইনা' আর বলা হয়েছে যে, 'তওবা ও ইস্তেগফার' এর অভ্যন্তরে যে তাৎপর্য নিহিত রয়েছে তা যথার্থভাবে ও প্রকৃত অর্থে ওই উম্মতের জন্য প্রযোজ্য হবে আর তাদেরকে এমন এক শরীয়ত প্রদান করা হবে যা ওই বিষয়াদিকে (তওবা ও ইস্তেগফার) সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে।

ধর্মীয় রীতিনীতি ও ইসলামের পরিভাষা অনুযায়ী 'তওবা' এর চারটি ধাপ বা চারটি আঙ্গিক রয়েছে ঃ–

এক–পাপকর্ম পরিহার করা। যেমন–কারও মিথ্যা বলার অভ্যাস রয়েছে; সে এক পাপকর্মে লিপ্ত আছে। এমন অবস্থায় মিথ্যা বলা পরিত্যাগ করার নাম তওবা। এ হল 'তওবার'র একটি আঙ্গিক বা স্তর

দুই– পাপকর্মের প্রতি ঘৃণা ও লজ্জা জন্মানো এবং কোন এক অবস্থায় পাপকর্ম করা হলে তার জন্য অনুতাপ ও অনুশোচনা সৃষ্টি হওয়া। প্রত্যেক ব্যক্তি সব সময়ই মিথ্যা বলে না কিন্তু এক ব্যক্তি এক দীর্ঘ সময় ধরে মিথ্যা বলল না, ধরা যাক ছয় মাস সে কোন মিথ্যা বলল না তাহলে পাপ পরিত্যাগ (ওই ছয়মাস) তো হল কিন্তু তওবা নয় কেননা পাপ-কর্ম পরিত্যাগ করা ছাড়াও তওবাতে পাপকর্মের প্রতি ঘৃণা ও পাপের কারণে অনুতাপ ও অনুশোচনা সৃষ্টি হওয়াও আবশ্যকীয়।

তিন– এই-সংকল্পই গ্রহণ করা যে, আমি এই পাপকর্মে আর কখনই লিপ্ত হব না–অর্থাৎ দৃঢ়সংকল্প গ্রহণের সাথে সাথেই পাপ পরিত্যাগকারী হয়ে যাওয়া এবং

চার–কোন কোন পাপকর্ম এমন হয়ে থাকে যার প্রতিকার বা সংশোধন সম্ভব। যেমন কারও এক শত টাকা মেরে দেয়া হল–এ ক্ষেত্রে তওবার অর্থ কেবল এটুকুই নয় যে ভবিষ্যতে আর কারও টাকা-কড়ি মেরে দেয়া থেকে বিরত থাকা হবে। আবার অনুতাপ ও অনুশোচনার সাথে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও গ্রহণ করা হলো যে আমি কখনও এমন পাপকর্মে আর লিপ্ত হব না কিন্তু সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ওই এক শত টাকা ফেরৎ দেয়া হল না যখন সে এতটা গরীবও নয় যে ওই একশত টাকা সে ফেরত দিতে পারছে না। এমন অবস্থাতে এটা তওবা নয়।

এই চার আঙ্গিকের প্রতিটি স্তরের দাবী পূর্ণ করার জন্য আবশ্যকীয় যে আমরা আমাদের স্রষ্টার কাছ থেকে শক্তি ও সামর্থ্য অর্জনে ব্রতী হই কেননা পাপকর্ম পরিত্যাগ করা খোদাতাআলা থেকে অর্জিত শক্তি ছাড়া সম্ভবই নয়। পাপকর্মের প্রতি লজ্জা ও ঘৃণাবোধ জন্মানো তাঁর প্রদত্ত অনুকম্পা ব্যতিরেকে অসম্ভব। অবশিষ্ট রইল দৃঢ়সংকল্প। প্রতিজ্ঞা গ্রহণ! তুচ্ছ এ মানুষের মধ্যে কি করে এই সাহস হতে পারে যে সে এই দাবী করে বসবে যে আমি আল্লাহ্‌তাআলা প্রদত্ত শক্তি-সামর্থ্য ছাড়া আল্লাহ্‌তাআলার থেকে শক্তি সামর্থ্য লাভ করা ছাড়া এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে পারি, এই দৃঢ় ইচ্ছা ধারণ করতে পারি যে 'ভবিষ্যতে কোনই পাপকর্ম করব না'। অতএব এর জন্য খোদাতাআলা প্রদত্ত শক্তি সামর্থ্যের প্রয়োজন। আর সাধ্যে যতদূর কুলায় প্রতিকার ও সংশোধনে নিয়োজিত থাকা। এর জন্য আল্লাহ্‌তাআলা থেকে শক্তি ও সামর্থ্য অর্জন করার আবশ্যকতা অপিরিহার্য।

আবশ্যকীয় এই শক্তি-সামর্থ্য ইস্তেগফারের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে। খোদার অনুগতরা নিজেদের প্রভু-প্রতিপালক'কে সকল শক্তি ও সামর্থ্যের মূল উৎস ও প্রস্রবণ ধারা বলে জানে আর নিজেদের অভ্যন্তরে কোনই শক্তি ও

সামর্থ্য খুঁজে পায় না ও প্রত্যক্ষও করে না। এ কারণে প্রতিটি কাজ করার পুর্বে তারা নিজেদের প্রভুর প্রতি বিনয়াবনত হয় আর ইস্তেগফার করতে থাকে সেই সাথে স্বীয় প্রভূর কাছে নিবেদন করে হে খোদা! তুমিই সকল শক্তি ও সামর্থ্যের উৎস, তাবৎ ক্ষমতার আঁকড়-আঁধার-ভান্ডার। তুমি আমাকে ওই সব শক্তি-সামর্থ্য ক্ষমতা ও মেধা দান কর যাতে আমি কুকর্ম ও মন্দসমূহ পরিত্যাগ করে সৎকর্মের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাই। এই অর্থে প্রথমে ইস্তেগফারের অবস্থান আর পরবর্তীতে তওবা। ইস্তেগফার করা ব্যতিরেকে তওবায় প্রতষ্ঠিত থাকা সম্ভবই নয়। এই বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বিশ্লেষণসহ বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "ইস্তেগফার ও তওবা দু'টি বিষয়। একদিক থেকে ইস্তেগফার'এর তওবার উপর প্রাধান্য রয়েছে। কেননা, ইস্তেগফার হচ্ছে প্রতিবিধানকারী সহায়ক শাক্তি যা খোদাতাআলা থেকে অর্জন করতে হয় আর তওবা হলো স্বীয় পদে দন্ডায়মান থাকা। ঐশী বিধান এই-ই যে যখন আল্লাহ্তাআলার সমীপে সাহায্য যাচনা করা হয় তখন খোদাতাআলা এক বিশেষ শক্তি দান করেন আর সেই শক্তি লাভ করে মানুষ পরবর্তীতে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যায়, সৎকর্ম সাধন করতে তার মধ্যে এক প্রেরণাময় শক্তির উদ্ভব ঘটে যার নাম 'তুব্ ইলাইহে' এরূপ নিয়ম চিকিৎসা পদ্ধতিতেও রয়েছে। আধ্যাত্মিক জগতের পথচারী (সালেক) এর জন্য ওতে এক উদ্দেশ্য নিহিত রাখা হয়েছে যে ওই পথে পরিভ্রমণকারী সর্বাবস্থায় খোদার কাছে সাহায্য যাচনা করুক। সালেক (আধ্যাত্মিক জগতের পথচারী) খোদাভক্ত, যতক্ষণ আল্লাহ্তাআলা থেকে শক্তি ও সামর্থ্য লাভ না করছে কী-বা সে করতে পারে!! তাই ইস্তেগফারের পরেই তওবা করার সামর্থ্য মিলে। যদি ইস্তেগফারই করা না হয় তবে স্মরণ রেখো যে তওবার প্রাণশক্তি অবশ্যই নির্বাপিত হয়ে যায়। আর যদি এভাবে ইস্তেগফারে রত থাকো ও তওবা করো তবে পরিণাম হবে ইউমাত্তেউকুম মাতাআন হাসানা ইলা আজালিম মুসাম্মা (হুদ ঃ ৪) (অনুবাদ–তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদের উত্তম পার্থিব সম্পদ দান করবেন)।

আল্লাহ্তাআলার বিধানসমূহ এই রীতিতেই চলমান যে যদি ইস্তেগফার ও তওবায় রত থাকো তাহলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। প্রত্যেকের জন্য এক সীমারেখা, এক এলাকা, এক ক্ষেত্র রয়েছে যাতে সে ঈপ্সিত লক্ষ্যমাত্রায় উন্নতি লাভ করতে পারে।" (মলফুযাত ১ম খন্ড, আল হাকাম ২৪ জুলাই ১৯০২ পৃঃ ১০)।

তিনি (আঃ) বলেন, নিজ নিজ গতিতে অবস্থান করে যতটা তোমার পক্ষে করা সম্ভব আধ্যাত্মিকতায় ক্রমোন্নতি লাভ করতে থাকো আর তা লাভ করতে থাকো ইস্তেগফার ও তওবার মাধ্যমে।

অপর এক স্থানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ–

"এ বিশদ বর্ণনা থেকে প্রকাশ পায় যে ইস্তেগফার যাচনা করার প্রকৃত অর্থ এটাই যে তা এজন্য করা হয় না যে কোন অধিকার হরণ করা হয়েছে বরং এই কামনা ও আকাঙ্ক্ষা থাকে যে কোন অধিকারই যেন খর্ব না হয় হৃত না হয়। মানব প্রকৃতি নিজেকে দূর্বল অবস্থায় দেখে এর প্রতিবিধানকল্পে খোদাতাআলার কাছে শক্তির মুখাপেক্ষী হয়ে শক্তি সামর্থ্য যাচনা করে................আর এটা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত প্রদর্শন করে যে মানুষ পবিত্রতার উচ্চ মার্গে ও মধ্যস্ততার উঁচু স্তরে তখনই পৌছাতে পারে যখন সে নিজের দূর্বলতা দূর করতে আর অন্যদেরকে পাপের বিষমুক্ত করতে প্রতি নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে প্রতিটি মুহূর্তে দোয়ারত থাকে ও অনুনয় বিনয় ও মিনতির সাথে খোদাতাআলা প্রদত্ত শক্তি আকর্ষণ করে নিজের দিকে টানতে থাকে আর কামনা করে যে এই শক্তি ও সামর্থ্যের অংশ অন্যরাও লাভ করুক যাতে ঈমানের সাথে তাদের সংযোগ সাধিত হয়ে যায়। নিষ্পাপ মানুষের খোদাতাআলার কাছে শক্তি সামর্থ্য যাচনা করা এজন্য অতি আবশ্যক যে মানব-প্রকৃতি তো নিজ সত্ত্বায় কোন সৌন্দর্য কোন পূর্ণতাই ধারণ করে না বরং সর্বদা খোদা থেকে সৌন্দর্য ও পূর্ণতা পেয়ে থাকে আর নিজ সত্ত্বায় কোন শক্তি ও সামর্থ্যও রাখে না বরং খোদা থেকেই শক্তি ও সামর্থ্য লাভ করে আবার নিজ সত্ত্বায় কোন আলোকময় দ্যুতি ও জ্যোতিঃও রাখে না বরং খোদা থেকেই তার উপর আলোকময় দ্যুতি নিপতিত হয়। এর প্রকৃত রহস্য এই যে 'সৌন্দর্য্য আকাঙ্ক্ষী প্রকৃতি'-কে কেবল এক আকর্ষণ ও অনুরাগ প্রদান করা হয় যাতে সে অনন্ত ও সীমাহীন সৌন্দর্যময় মহাশক্তিকে নিজের দিকে টানতে, আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। যেহেতু পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যে সদা-বিদ্যমান ওই ভান্ডার থেকে ফিরিশ্তারাও শক্তি টেনে নেয়, আর অনুরূপভাবে ইনসানে কামেলও (পূর্ণতাপ্রাপ্ত মানব) শক্তির এই মহা উৎস থেকে ইবাদতের–দাসত্বের নল-পথ (উবুদিয়ত কি নালী) দিয়ে পবিত্র ও কল্যাণপূর্ণ শক্তি আকর্ষণ করে নিজের দিকে শুষে নেয় ....অতএব দেখ ইস্তেগফার কী জিনিস! এ-ই হচ্ছে আজ্ঞানুবর্তীতার ফল! যে পথে শক্তি নিঃসরিত হয়ে সঞ্চিত হয়। তৌহীদের–একত্ত্ববাদের নিগুঢ় রহস্য এই নীতির সাথে সম্পৃক্ত যে পবিত্র গুণাবলীকে মানুষের এক মহামূল্যবান অনন্য সম্পদ নির্ধারণ না করে বরং তা অর্জনের নিমিত্তে খোদাকেই মূল উৎস নির্ধারণ করা। (রিভিউ অফ রিলিজিয়নস উর্দূ ১ম খন্ড পৃঃ ১৭৯-১৮০)। যখন আল্লাহ্তাআলা প্রদত্ত নিরাপত্তা অর্জিত হয়, যখন মানুষ আল্লাহ্তাআলা থেকে শক্তি ও ক্ষমতা পেয়ে যায় তখন সে তওবা করতে সক্ষম হয় আর তখন আল্লাহ্তাআলার সমীপে তার তওবা গৃহীত হয়। এ প্রেক্ষিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ–

অতএব দূর্বলতা ঝেড়ে ফেলে উঠে পড় আর তওবা করো। নিজ প্রভু ও মালিককে সৎকর্ম দিয়ে সন্তুষ্ট করতে লেগে যাও। স্মরণ রেখো ধর্মবিশ্বাস জনিত ভূল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যূতির শাস্তি মৃত্যুর পরে হয়ে থাকে। হিন্দু বা খৃষ্টান না মুসলমান, এর সিদ্ধান্ত হবে কিয়ামত দিবসে। কিন্তু যে ব্যক্তি যুলুম-নির্যাতন ও পাপ কর্মে এবং নির্লজ্জতায় ও ছিদ্রান্বেষণে সীমা ছাড়িয়ে যায়, ওই অবস্থানে তাকে শাস্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। কোন ভাবেই সে খোদা প্রদত্ত শাস্তি থেকে পালাতে পারে না। অতএব নিজ খোদাকে শীঘ্র সন্তুষ্ট করো নচেৎ সেদিন সমাগত ....। তোমরা খোদার সাথে আপোষ রফা করে ফেলো, সন্ধি করে নাও। তিনি বড়ই দয়াবান! এক মুহূর্তের বিনম্র তওবায় সত্তুর বছরের পাপ মোচন হয়ে যেতে পারে। আর এটা বলো না যে তওবা গৃহীত হয় না। মনে রেখো, তোমরা নিজেদের আমল দ্বারা-কৃত কাজ কর্ম দ্বারা কখনও বাঁচতে পারো না। সর্বদা তাঁরই অনুগ্রহ তোমাদের রক্ষা করে–কর্ম নয়। হে পরম দয়াময় ও বারবার কৃপাকারী খোদা! আমাদের সবার প্রতি করুণা কর যাতে আমরা তোমার দাস হয়ে তোমারই আস্তানায় পড়ে থাকতে পারি। আমীন! (লেকচার লাহোর, রূহানী খাযায়েন খন্ড ২০, পৃষ্ঠা-১৪৭)

গরমের কারণে আজ আমার অস্বস্তি ছিল। আর এখানে মসজিদেও বেশ গরম লাগছে বন্ধুদেরও দীর্ঘক্ষণ খুৎবা শুনতে কষ্ট হয়ে থাকবে। এ কারণে আজ এখানেই ক্ষান্ত করলাম। আর অবশিষ্টাংশ আল্লাহ্তাআলার দেয়া সামর্থ্য অনুযায়ী তাঁরই অনুগ্রহে আগমী খুতবায় বর্ণনা করব। (দৈনিক আল ফযল ১৮জুন ১৯৬৭ পৃঃ ১-৪)

অনুবাদ ঃ **মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্**

[সিংগাপুরে উষ্ণ অভ্যর্থনা এবং বিভিন্ন দেশ থেকে আগত পরিবারদের সাথে সাক্ষাতকার]

সিংগাপুর সফর

সৈয়্যদনা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ)

৩য় খন্ড

৮ এপ্রিল ২০০৬

সকাল সোয়া ছয়টায় হুযূর আনোয়ার বায়তে ত্বাহাতে এসে নামায ফযর পড়ান। নামায আদায়ের পর হুযূর নিজের আবাসস্থলে আবার ফিরে যান। সকালে হুযূর আনোয়ার নিজে ডাক দেখেন। কর্মসূচী অনুসারে হুযূর (আইঃ) সকাল সাড়ে দশটায় বায়তে ত্বাহাতে আসেন। এখানে পারিবারিক ও একক সাক্ষাতকারের প্রোগ্রাম শুরু হয়।

পারিবারিক সাক্ষাতকার ঃ

ইন্দোনেশিয়া ও মালোয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ড থেকে আগত ৬৫টি পরিবারের ৩৩১জন সদস্য হুযূর আনোয়ার (আইঃ)-এর সাথে এ দিন সাক্ষাতের সম্মান পায়। আর হুযূর আনোয়ারের সাথে ছবি তোলার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

আল্লাহ্তাআলার ফযলে ইন্দোনেশিয়া থেকে ৭৬১ জন পুরুষ, মহিলা ও বাচ্চা তাদের প্রিয় খলীফার সাথে সাক্ষাতের জন্য হাজির হয়। এভবে মালোয়েশিয়া থেকে সম্ভবত ৩২০ জনের বেশি পুরুষ, মহিলা ও বাচ্চারা হুযূরের সাথে সাক্ষাতের জন্য আসেন। এছাড়া থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, মিয়ানমার (বার্মা), শ্রীলঙ্কা,ভারত, মরিশাস, ইউ,কে, কম্বোডিয়া, ব্রুনাই এবং পাপুয়া নিউগিনি থেকেও বন্ধুদের প্রতিনিধিদল সিংগাপুর পৌঁছায়। এসব প্রেমিকরা তাদের প্রিয় খলীফার সাক্ষাতের এক মুহূর্ত হাত থেকে যেতে দিচ্ছিল না। যত সংখ্যায় লোকজন এসেছে সেইরূপ সংখ্যায় ক্যামেরা তাদের হাতে আছে। পুরুষ, মহিলা ও বাচ্চারা হুযূর (আইঃ)-এর মসজিদে আসা ও ফেরত যাওয়ার প্রতি মুহূর্ত নিজেদের ক্যামেরা তাক করে রাখে। হুযূর আনোয়ার যখনই গেটের মধ্যে ঢুকবেন তখন নিজেদের হুযূরের আগমনের প্রত্যাশীরা এবং হুযূর আনোয়ারের সাথে সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল এসব লোকেরা সোজা হয়ে দাঁড়িযে যেতেন। নিজেদের হাত নেড়ে আস্সালামু আলাইকুম বলতেন। আর সাথে সাথে ছবি উঠাতেন। নামায শেষ হওয়ার সাথে সাথে এসব লোক সবার ছবি নেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন এবং মসজিদ থেকে ফেরত যাওয়ার প্রতি পদে ছবি তুলতেন। মহিলা বাচ্চারাও পিছিয়ে ছিল না, তারাও হাত নাড়তো এবং হুযূরকে দেখে বচ্চারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দাঁড়িয়ে হুযূর আনোয়ারের ছবি নিরবিচ্ছিন্নভাবে তুলছিল। সমস্ত পরিবেশ খুব মনগ্রাহী এবং ঈমান বর্দ্ধক ছিল। ইন্দোনেশিয়ার ২৬টা জামাত থেকে এসব লোকেরা অনেক দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করে সিংগাপুরে আসে।

এভাবে মালোয়েশিয়া থেকে আগত পরিবারগুলো বিভিন্ন এলাকা থেকে অনেক দুরত্ব অতিক্রম করে হুযূর আনোয়ারের সাথে সাক্ষাতের জন্য পৌঁছায়।

হুযূর আনোয়ারের সাথে তাদের সাক্ষাতকারের এ কর্মসূচী দুপুর সোয়া দুটা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। সাক্ষাতকারের পরে হুযূর আনোয়ার বায়তে ত্বাহাতে এসে যোহর ও আসরের নামায জমা করে পড়ান। নামাযের পর হুযূর তার অবস্থান স্থল গ্রান্ড মারকারী রোক্সী হোটেলে চলে যান।

ইন্দোনেশিয়ায় ন্যাশনাল আমেলার মিটিং ঃ

বিকেল পাঁচটায় হুযূর আনোয়ার জামাতের কেন্দ্র বায়তে ত্বাহাতে আসেন। কর্মসূচী অনুসারে হুযুর (আইঃ)-এর সাথে ইন্দোনেশীয়া মজলিসে আমেলার মিটিং শুরু হয়। হুযূর দোয়া করান। দোয়ার পর হুযূর আনোয়ার আমেলার কর্মকর্তাদের সাথে পরিচিত হন। তাদের দপ্তরের কার্যক্রম জরিপ করেন এবং নির্দেশ দান করেন।

সেক্রেটারী তবলীগের কাছে হুযূর (আইঃ) জিজ্ঞাস করেন, "আপনি তবলীগের কাজ কিভাবে করেন, আপনার কি কোন পরিকল্পনা আছে? জামাতের বর্তমান অবস্থায় আপনার প্লনিং কি? হুযূর আনোয়ার খুবই বিস্তারিতভাবে জামাতের বর্তমান অবস্থা নিরীক্ষা করেন। আর এ সম্পর্কে কিছু প্রশাসনিক নির্দেশ দেন। হুযূর আনোয়ার বলেন, যে সব বিশেষ এলাকায় জামাতের বিরুদ্ধে দাঙ্গা হয়েছে এবং জামাত ক্ষাতিগ্রস্ত হয়েছে। সে সব এলাকায় আহমদী বন্ধুরা তবলীগ করবেন। বুৎপত্তি সম্পন্ন আহমদীরা সেখানে জন-সংযোগ করলে তাদের ভুল বিশ্বাস দুর হবে। তাদের বলুন, আহদীয়াত তা নয় যা বিরোধীরা আপনাদের বলে। হুযূর আনোয়ার বলেন, ওই সব লোকদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক সৃষ্টি করুন। যে সব এলাকায় হামলা হয়েছে সেখানের ৫ শতাংশ লোক ফাসাদ সৃষ্টিকারী। ৯৫ ভাগ লোকদের ঐ সব বিষয়ের সাথে কোন সম্পর্ক নেই।

হুযূর বলেন, এসব এলাকার জ্ঞানী ও সম্মানীত লোকদের সাথে আপনাদের পরিচয় হলে তারা জানতে পারবে যে আপনারা কারা । তখন এসব লোকও আপনাদের সাহায্যকারী হতে পারে। তিনি (আইঃ) বলেন গ্রামীন এলাকায় তবলীগের কাজ করুন এবং তারপর পরিকল্পনা তৈরী করুন।

হুযূর বলেন, গত দশ বছরে যে সব বয়াত হয়েছে তার নিরীক্ষা করুন। আর জনসংযোগের নির্দেশ দিন। যাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে তাদের সাথে আবার সম্পর্ক সৃষ্টি করার চেষ্টা করুন। আর নিজের সম্পর্ক স্থাপন করুন।

হুযূর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন, গ্রামীন এলাকায় দেশের জনসংখ্যার কত অংশ বাস করে? তাকে বলা হয় যে ২৩ কোটি জনসংখ্যার ৭০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। এর মধ্যে এলাকা অনুসারে কিছু কম বেশি আছে। হুযূর

(আইঃ) বলেন, এরূপ অবস্থা সত্ত্বেও আপনাদের পরিকল্পনা কি। ইন্দোনেশিয়ার আমীর সাহেব বলেন, লিফলেট বিতরণ করি। এছাড়া পকেট সাইজের ডিক্স বিতরণ

করি। যাতে জামাতের পরিচয়, জামাতের সেবা, ইউরোপের দেশগুলোতে জামাতে বয়াতও কেন্দ্রের উল্লেখ আছে। অডিও এবং ভিডিও দুটোতেই খুবই ভাল ফল দিয়েছে। হুযূর আনোয়ার এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে শোনেন। আর নির্দেশ দেন যে জামাতের বিরুদ্ধে আপত্তি সমূহের উত্তরও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করবেন।

হুযূর আনোয়ার বলেন, প্রত্যেক গ্রাম ও প্রত্যেক এলাকায় নিজেদের টিম তৈরী করুন। যারা সেখানের স্থানীয় লোকদের তবলীগ করবে। তাদের সু-সংবাদ পৌঁছাবে। তাদের সাথে নিজেদের সম্পর্ক স্থাপন করবে। আর তাদের ভূল ধারণা দূর করবে। হুযূর আনোয়ার বলেন, ইন্দোনেশীয়াতে যখনই ইনশাআল্লাহ্ পরিবর্তন হবে, সে সময় লোকদের ইসলামের শিক্ষা দেয়া মুশকিল হবে। এ কাজের জন্য আপনি আহমদীদের প্রশিক্ষণ দিন, তারা যেন ভবিষ্যতে শিক্ষক হতে পারে। আপনাদের নিজেদের ভষ্যিতের জন্য পরিকল্পনা করুন। আর আহমদী বন্ধুদের প্রশিক্ষণ আর তরবীয়ত দিন। তারা যেন ভবিষ্যতে অধিক সংখ্যক আগত লোকদের তরবীয়ত দিতে পারে।

হুযূর আনোয়ার সেক্রেটারী মালকে ইন্দোনেশিয়া জামাতের সালানা বাজেট, চাঁদা আমের বাজেট, চাঁদা দাতাদের সংখ্যা এবং প্রত্যেক ব্যক্তির চাঁদা দেয়ার মাপকাঠি সম্পর্ক জিজ্ঞাসা করেন। হুযূর আনোয়ার হেদায়াত দেন যে আপনাদের চাঁদার মাপকাঠি ভাল হতে পারে। এদিকে লক্ষ্য দিন। আর নিজেদের চাঁদার পরিমাণ বাড়ান।

হুযূর (আইঃ) বলেন, আপনারা কর্মক্ষম ও গতিশীল জামাত। প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত বাজেট বাড়ান। জামাতে সেক্রেটারী মাল আছে। তার সাথে এ কাজ করার জন্য এডিশনাল সেক্রেটারী মাল বানান। আর এক সাথে কাজ করুন। হুযূর (আইঃ) বলেন, আমাদের কাজ কেবল টাকা জড়ো করা নয়। বন্ধুদের রুহানী মাপকাঠি বাড়াতে হবে, কুরআন করীমে আল্লাহতাআলা নামাযের পরে মালী কুরবানীর উল্লেখ করেন। যেন নামাযের সাথে মালী কুরবানীর সাহায্যে মানুষের আধ্যাত্মিক মাপকাঠি উঁচু হয়।

হুযূর আনোয়ার বলেন, যখন আপনারা ব্যক্তিগতভাবে লোকদের সাথে যোগাযোগ করে বাজেট তৈরী করবেন তখন প্রথম প্রথম কিছু অসুবিধা হবে। কিন্তু আপনারা সুশৃঙ্খল ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত জামাত, লোকদের মালী কুরবানী সম্পর্কে বলুন, তা বুঝিয়ে দেন যে মালি কুরবানী খুবই জরুরী। আর এর কি উপকারিতা। হুযূর বলেন, এভাবে সব জামাতের বাজেট করুন। তিনি বলেন যে, যদি কোন জামাতে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাজেট এবং চাঁদা আদায় কম হয় তবে সুস্পষ্টভাবে জানাতে হবে যে এ জামাতে এত বাজেট ছিল। আর এই প্রকৃতিক দুর্যোগের কারণে চাঁদার আদায় কম হয়েছে।

হুযূর আনোয়ার কিছু উদাহরণ দিয়ে বলেন, একই অবস্থার মধ্যে আহমদীদের ফসল অন্যদের থেকে কয়েকগুণ ভাল হয়। আর এ খোদার রাস্তায় কুরবাণী করার ফল।

হুযূর বলেন, কেবলমাত্র চাঁদা জড় করা উদ্দেশ্য নয়। আমরা চাঁদা আদায়কারী নই। চাঁদা আদায়ের ফলস্বরূপ সাথে সাথে তরবীয়ত হয় এবং আধ্যাত্মিক মাপকাটি উঁচু হয়।

হুযূর আনোয়ার সেক্রেটারী মাল সাহেবকে বলেন যে চাঁদা আদায়ের জন্য তরবীয়তী প্রোগ্রামের মাধ্যমে সেক্রেটারী তরবীয়ত আপনাকে সাহায্য করবেন।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এ সংগঠন প্রতিষ্ঠার যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন তা হুযুর আনোয়ার বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করেন। হুযূর আনোয়ার বলেন, যদি জামাতের ব্যবস্থাপনা দূর্বল হয় আর অঙ্গসংগঠন বা কোন একটি অঙ্গ সংগঠন খুব কর্মক্ষম হয় তবে জামাত উন্নতি করতে থাকে। যদি অংগসংগঠন সুদৃঢ় ও কর্মক্ষম না হয় কিন্তু জামাত ব্যবস্থাপনা গতিশীল হয় তাহলেও জামাত আস্তে আস্তে আগে বাড়তে থাকে। কিন্তু যদি জামাতের ও অংগসংগঠন গতিশীল দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত ও কর্মক্ষম হয়, তাহলে জামাত কয়েকগুণ দ্রুতগতিতে উন্নতি করতে থাকে। আর জামাতের পদক্ষেপ অসাধারণ ভাবে আগে বাড়তে থাকে।

সেক্রেটারী মালকে হুযূর আনোয়ার হেদায়েত দেন এবং বলেন আপনি ন্যাশনাল সেক্রেটারী মাল। আপনি কেবল মাত্র স্থানীয় জামাতের সেক্রেটারী মালের মাধ্যমে আদেশ করতে পারেন। কিন্তু কায়েদে মাল কিম্বা খোদ্দামুল আহমদীয়ার সেক্রেটারী মালের সাহায্যে চাঁদা আদায় করতে পারেন না। তারা কেবলমাত্র নিজেদের অংগ সংগঠনের চাঁদা আদায় করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, অঙ্গসংগঠন সরাসরি খলীফাতুল মসীহ এর অধীন। আর তাদের রিপোর্ট সরাসরি আমার কাছে আসে। আমি তাদের রিপোর্ট দেখি আর তাতে নিজের অভিমত পেশ করি। সেক্রেটারী তরবীয়তের কাছে হুযুর আনোয়ার জানতে চান, আপনার সালানা প্রোগ্রাম কি? তিনি বলেন তরবীয়তের দিকে খুব বেশি জোর দিন।

হুযূর আনোয়ার জিজ্ঞাস করেন দেশের মধ্যে যেখানে যেখানে আমাদের মসজিদ আছে, সেন্টার আছে সেখানে আহমদীরা ঐ সেন্টার বা মসজিদ থেকে কত দূর বা ব্যবধানে থাকে। এ সম্পর্কে হুযূর আনোয়ারকে বলা হয় যে গ্রামে তো সেন্টারের কাছেই থাকে। কিন্তু শহরে দূরে এবং বিভিন্ন দুরত্বে থাকেন। হুযূর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন কোন নামাযে সবচেয়ে বেশি মানুষ উপস্থিত থাকে। আর শতকরা কত জন লোক উপস্থিত থাকে। তিনি বলেন, সব জামাতের সেক্রেটারী তরবীয়তকে বলুন যে, তারা যেন নিয়মিত নামাযের উপস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট পাঠান।

সদর, খোদ্দামুল আহমদীয়ার কাছে তিনি জামাত চান নামাযে উপস্থিতি বড়ানোর জন্য কি চেষ্টা করছেন। নামাযের জন্য মসজিদে কতজন খোদ্দাম আসেন। হুযূর আনোয়ার তাকে প্রতি মাসে নিয়মিত ভাবে এ সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে বলেন।

হুযূর আনোয়ার ইন্দোনেশিয়ার সদর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার নিকট মজলিসের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। আর হেদায়েত দেন, যে সব মজলিসে এখনও নির্বাচন হয়নি। সেখানে নিজেই সফর করুন, কিম্বা নিজের প্রতিনিধি পাঠান এবং তাদের সক্রিয় করুন। ওখানে কায়েদ নিয়োগ দিন। তারা মজলিসে আমেলা

বানাবে। যেখানে তিন জনের বেশি খোদ্দাম আছে সেখানে নিজেদের মজলিস কায়েম করুন। যে সকল স্থানে উপযুক্ত খোদ্দাম নেই সে মজলিসকে অন্য কোন মজলিসের সাথে সংযুক্ত করে দিন।

হুযূর আনোয়ার বলেন, মাগরেব ও এসার নামাযে খোদ্দামদের উপস্থিতি বেশি হওয়া উচিত। তিনি বলেন, আগামী মাসে রিপোর্ট আসা চাই যে কত খোদ্দাম নামাযে উপস্থিত হয়েছে। আর এ সম্পর্কে কি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

জামাতের বন্ধুদের তরবিয়ত সম্পর্কে হুযূর আনোয়ার আরো বলেন, যদি খোলাখুলিভাবে তবলীগ করতে না পারেন তবে নিজেদের তরবীয়ত করায় তো কোন বাধা নেই। মুরব্বীগণ এদিকে মনোযোগ দিন। তরবীয়তী কর্মসূচীর দিকে ধ্যান দিন। যে সব লোকেরা দুর্বল। জামাত থেকে সরে গেছে এবং যাদের সাথে যোগাযোগ নেই। তাদের সাথে যোগযোগ স্থাপন করুন। তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসুন।

হুযূর আনোয়ার বলেন, তরবিয়তের জন্য যে সব কর্মসূচী তৈরী করবেন তার ফিড ব্যাক ঋববফ নধপশ হওয়া চাই। যতক্ষণ পর্যন্ত ফিড ব্যাক না হবে, ফলাফলের কোন হাদিস পাওয়া যাবে না। যে কোন কর্মসূচী তৈরী করুন, তার ফলাফল পাওয়ার চেষ্টা করুন।

ইন্দোনেশিয়ার সদর আনসারুল্লাহ্‌কে নির্দেশ দিতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার বলেন, আপনিও তরবীয়তের কর্মসূচী তৈরী করুন। যদি মসজিদে আনসারগণ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ উপস্থিত হয়, তবে চেষ্টা করলে শতকরা ৭৫ ভাগ পর্যন্ত উপস্থিতি বাড়তে পারে। বেশী আনসার হলে যুবকদের জন্য উদাহরণ হবে।

সেক্রেটারী ওয়াকফে নও নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন, ইন্দোনেশীয়ার ওয়াকফে নওদের সংখ্যা ৮৮২জন। হুযূর আনোয়ারের জিজ্ঞাসার উত্তরে সেক্রেটারী সাহেব বলেন, এর মধ্যে ১৫ বছর বয়সের বাচ্চাদের সংখ্যা ১৬৪ জন। হুযূর আনোয়ার জানতে চান যে, সকলে কি ওয়াকফ করতে প্রস্তুত। আর তাদের ভবিষ্যতের জন্য কি দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সেক্রেটারী সাহেব বলেন এর মধ্যে ৬০জন মুরব্বীও ৩০ জন ডাক্তার হতে চায়। এখানে একটি কমিটি আছে যারা বাচ্চাদের গাইড করে।

হুযূর আনোয়ারের জিজ্ঞাসার উত্তরে সেক্রেটারী সাহেব বলেন, ওয়াকফে নও এর চারটি বই ইন্দোনেশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

হুযূর আনোয়ার বলেন, যে সব ওয়াকফে নও বাচ্চা জামেয়াতে যাবে তারা তো ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ করবে। কিন্তু যে সব বাচ্চারা জামেয়াতে যাবে না তারা ধর্মীয় শিক্ষা কোথা থেকে শিখবে।

হুযূর আনোয়ার ইন্দোনেশিয়ার আমীর সাহেবকে নির্দেশ দেন যে, একটি কমিটি তৈরী করুন। এরূপ বাচ্চাদের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য সিলেবাস থাকবে। যার মধ্যে কুরআন করীমের তর্জমা, হাদীস ও হযরত আকদাস মসীহ মাওউদের কিতাব থাকবে। মুরব্বীগণ, যারা উর্দু জানেন তারা বই অনুবাদ করতে পারেন। অনেকে ইংরেজী থেকে অনুবাদ করতে পারেন।

হুযূর আনোয়ার বলেন, বিশ বাইশ বছর বয়স্ক সব ওয়াকফে নওদের কুরআন করীমের তর্জমা জানা চাই। কমপক্ষে হাদীসও হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বই থেকে কিছু অংশ অবশ্যই জানা উচিত।

হুযূর (আইঃ) বলেন, যে সব বাচ্চারা ১৫ বছর বয়সে পৌঁছেছে, তারা যেন সব সময় যোগাযোগ রাখে। তাদের বলতে হবে যে সেই সব পেশা গ্রহন কর যা জামাতের জন্য ভাল। কয়েকজন বাচ্চা সাক্ষাতের সময় বলেছে যে তারা ব্যবসায়ী হবে। কারণ তাদের বাবা ব্যবসায়ী। হুযূর আনোয়ার বলেন, যারা নিজেদের জীবন ওয়াকফ করেছে তাদের তো ধন সম্পত্তি সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত নয়। জামেয়া আহমদীয়ার প্রিন্সিপাল হেদায়তুল্লা সাহেবের কাছে হুযূর আনোয়ার জামেয়ার কোর্স সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যে তিন বছর থেকে বেড়ে পাঁচ বছরের হয়েছে কিনা। প্রিন্সিপাল সাহেব বলেন, হ্যাঁ, পাঁচ বছর হয়েছে। প্রত্যেক বছর ছাত্র নেয়া হয়। হুযূর আনোয়ার বলেন, আপনারা বছরে ২০ জন ছাত্র নেন। তাহলে এক বছরে ৬০জন ওয়াকফে নও বাচ্চা এলে আপনারা তাদের কিভাবে ভর্তি করবেন। কিভাবে নেবেন। হুযূর বলেন এখন থেকে এর জরীপ করুন এবং ব্যবস্থা নিন।

সেক্রেটারী জায়েদাদ এর কাজ সম্পর্কে হুযুর (আইঃ) জিজ্ঞাসা করেন, ইন্দোনেশিয়াতে ১৩ হাজার দ্বীপের মধ্যে কতটি দ্বীপে জামাত আছে। হুযূর আনোয়ার নির্দেশনা দেন, যে জমি আপনি নিয়েছেন তার হিসাব আপনাকে নিতে হবে। সেক্রেটারী যায়েদাদ জানান যে এখন পর্যন্ত জামাতের ৪৩.৭ হেক্টের জমি আছে। জামাতের সম্পত্তি ও কেন্দ্রের হেফাযতের জন্য হুযূর আনোয়ার কিছু কিছু বিষয়ে খোজ খবর নেন। আর ব্যবস্থাপনার বিষয় নির্দেশ দেন। কিছু প্রয়োজনীয় খোজ খবর নেয়ার জন্য বলেন।

মোহাসেব-এর কাছে হুযূর আনোয়ার তার কাজের রিপোর্ট চান এবং দিক নির্দেশনা দেন। ইন্দোনেশিয়ার ন্যাশনাল আমেলার সাথে এ মিটিং সন্ধ্যা ৭টা ১০ মিনিট পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। মিটিং এর পর মজলিসে আমেলার সদস্যরা হুযূর আনোয়ারের সাথে ছবি তোলার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

ইন্দোনেশিয়ার মজলিসে আমেলার মিটিং এর পর সোয়া সাতটার সময় ইন্দোনেশিয়ার ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা লাজনা ইমাইল্লার সাথে হুযুর আনোয়ারের মিটিং শুরু হয়। হুযূর আনোয়ার লাজনা ইমাইল্লার সকল কর্মকর্তার সাথে তাদের দপ্তর ও কাজের জরীপ করেন। আর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাস করেন। তাদের ভবিষ্যতে কর্মসূচী সম্পর্কে শোনেন। আর বিস্ত ারিতভাবে উপদেশ দেন এবং তাদের দিক নির্দেশনা দেন।

ইন্দোনেশিয়ার ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা লাজনা ইমাইল্লার এ মিটিং রাত পৌনে নটা পর্যন্ত জারী থাকে। এ মিটিং এর পর হুযূর আনোয়ার রাত ৯টায় বায়তে তৃহাতে মাগরেব ও এশার নামায জমা করে পড়ান। নামায পড়ার পর হুযূর আনোয়ার তাঁর অবস্থান স্থলে চলে যান।

(সৌজন্যে ঃ দৈনিক আলফযল ১৯ এপ্রিল ২০০৬)

রিপোর্ট–আব্দুল মজিদ তাহের

অনুবাদ–কওসার আলি মোল্লা

প্রফেসার আব্দুল লতিফ

এক বড়ে বুযুর্গ থে

(৫ম কিস্তি)

কুসংস্কারাচ্ছন্ন পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজে শিক্ষার আলো জ্বেলে দেয়ার উদ্দেশ্যে ১২ ডিসেম্বর ১৮৯৯ সালে চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি। পূর্ববাংলার বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সুতিকাগার যেমন চট্টগ্রামে হয়েছিল তেমনি সেখানে মুসলিম এডুকেশন সোসাইটির মাধ্যমে বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তারের প্রবাহ সৃষ্টি হয়। এ সমিতির উদ্দেশ্য হল ঃ–

(১) পাঠাগার স্থাপন, গঠন ও সংরক্ষণ।

(২) দরিদ্র মুসলিম মেধাবী ছাত্রদের সাহায্য দান।

(৩) মুসলমান পাঠকদের জন্য শহরের উপর একটি পাঠাগার স্থাপন।

(৪) হাদীস ও তফসীর শিক্ষার জন্য একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা এবং

(৫) মুসলমান ছাত্রদের জন্য শহরে একটি ছাত্রাবাস তৈরী করা।

ফলে জন্মলগ্ন থেকে এ সংগঠন অবহেলিত মুসলমান জনগোষ্ঠীর মাঝে শিক্ষা সংস্কৃতি ও কৃষ্টি সম্প্রচার এবং আত্মচেতনা সৃষ্টিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। বাঙ্গালী জাগরণে আলোর পথের দিশা প্রদান করে। সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের উন্মেষ ঘটায়। বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ছাত্রাবাস ও পাঠাগার স্থাপন এবং দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তিদানসহ সমাজ প্রগতির অগ্রযাত্রায় নানামুখী কাজ করে। শতবর্ষ আগে চট্টগ্রামের উচ্চ শিক্ষিত ও সমাজ সচেতন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছিলেন এ সোসাইটির সক্রিয় কর্মী, খান বাহাদুর আব্দুল আজিজ চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্কুল ইন্সেপেক্টর ছিলেন এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন চট্টগ্রাম প্রশাসনিক বিভাগের প্রথম গ্র্যাজুয়েট। চট্টগ্রামের কৃতি সন্তান জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলামের ভাষায় –"সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসহ ধর্মীয় মূল্যবোধকে অক্ষুন্ন রাখার মানসে অবিভক্ত ভারতের চট্টগ্রাম বিভাগের প্রথম দিকের মুসলমান গ্র্যাজুয়েটদের নিয়ে গঠিত হয় এ মহতী প্রতিষ্ঠান।" ফলে ঐশী ধর্মীয় মূল্যবোধে জাগ্রত এবং মানুষ গড়ার কারিগরের দায়িত্বে ব্রত জামাতে আহমদীয়ার সদস্য প্রফেসার আব্দুল লতিফ খান, খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী ও মোবারক আলী সাহেবদ্বয় চট্টগ্রামে বসবাসের শুরু থেকেই সতস্ফূর্তভাবে এ সোসাইটির সাথে জড়িয়ে পড়েন। সদস্য হয়ে সমিতির বিভিন্ন কর্মকান্ডে অনস্বীকার্য অবদান রাখেন। আব্দুল লতিফ সাহেব ছাত্র জীবনে কলকাতায় Royal Asiatic Society সদস্য পদ লাভে মুসলিম সমাজে জমাট বাধা আঁধারে শিক্ষার শীখা জ্বালাতে যে কাজ করেছিলেন সেই স্পৃহার অনুপ্রেরণায় কর্মজীবনে চট্টগ্রামে মুসলিম এডুকেশন সোসাইটির বিভিন্ন কর্মকান্ডে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৪ সালে প্রকাশিত সমিতির তেষট্টি জন সদস্যের তালিকায় ক্রমিক নম্বর দশে মৌলভী আব্দুল লতিফ লেকচারার চট্টগ্রাম কলেজ ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণালী হয়ে আছে। তিনি দশ দশকে এ সংগঠনের সভ্য হওয়ার পর সমিতির পুর্নগঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মনোনীত হন। বিদ্যানুরাগী কার্যনির্বাহী কমিটির সেই মহতী ব্যক্তিরা হলেন ঃ–

(১) এ, এইচ, ক্লেটন, আই, সি, এস, কমিশনার চট্টগ্রাম বিভাগ– সভাপতি।

(২) খান বাহদুর মৌলভী আব্দুল আজিজ বিএ, অবসরপ্রাপ্ত বিভাগীয় স্কুল ইন্সেপেক্টর–সেক্রেটারী।

(৩) খান বাহাদুর মৌলভী মোহাম্মদ মুছা, এম, এ, প্রিন্সিপাল চট্টগ্রাম মাদ্রাসা–সদস্য।

(৪) খান বাহাদুর মৌলভী মোহাম্মদ হাছন, প্রফেসার আরবী ও ফারসী বিভাগ চট্টগ্রাম কলেজ–সদস্য।

(৫) মৌলভী আব্দুল লতিফ খান, লেকচারার আরবী ও ফারসী বিভাগ চট্টগ্রাম কলেজ–সদস্য।

প্রফেসার আব্দুল লতিফ

(৬) মৌলভী এমদাদ আলী, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ইনসপেক্টর চট্টগ্রাম–সদস্য।

(৭) মৌলভী চৌধুরী নজির আহমদ মার্চেন্ট ও জমিদার চট্টগ্রাম–সদস্য।

(৮) মৌলভী জামাল উদ্দিন আহমদ হেড্ মৌলভী কলেজিয়েট স্কুল চট্টগ্রাম–সদস্য

(৯) মৌলভী আব্দুর রাজ্জাক, বি এ, বি,টি সহকারী শিক্ষক সরকারী মুসলিম হাইস্কুল চট্টগ্রাম–সদস্য।

খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি এবং এর অধীনস্থ ভিক্টোরিয়া ইসলামীয়া ছাত্রাবাসের সেক্রেটারীর গুরুদায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। এ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী খান বাহাদুর আব্দুল আজিজ বলেন–১৮৯৯ সালের ডিসেম্বর মাস হতে অদ্যবধি (১৯২৪ সালের কথা–লেখক) আমি এই শিক্ষা সমিতির ও ছাত্রাবাস কমিটির সেক্রেটারী পদে কার্য করে আসছি।। আমার বিদায়কালে ও সরকারী কার্যোপলক্ষে স্থানান্তরে অবস্থান সময়ে যে সকল মহোদয় সেক্রেটারী পদে সমাসীন ছিলেন, তাঁদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ–

(১) মৌলভী মতলুব আহমদ খান চৌধুরী, এম,এ, চট্টগ্রামের ডিপুটী স্কুল ইনস্পেক্টর (রাজশাহী বিভাগের বর্তমান স্কুল ইনস্পেক্টর)।

(২) খান সাহেব আবুল হাশেম খান চৌধুরী, এম এ, চট্টগ্রামের ডিপুটী স্কুল ইনস্পেক্টর (বর্তমান স্কুলসমূহের ২য় ইনস্পেক্টর)।

(৩) শামসুল ওলামা মৌলভী কামাল উদ্দিন আহমদ, এম, এ, চট্টগ্রাম মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল (চট্টগ্রাম কলেজের বর্তমান প্রিন্সিপাল)।

(৪) মৌলভী সৈয়দ মোহছেন আলী বি,এ চট্টগ্রাম বিভাগের সহকারী স্কুল ইনস্পেক্টর।

(৫) মৌলভী মাহতাবউদ্দিন আহমদ, বি,এ চট্টগ্রাম বিভাগের সহকারী স্কুল ইনস্পেক্টর।

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যারিকুলাম তৈরীর জন্য সরকার পান্ডিত্যের কর্মবীর খান বাহাদুর আব্দুল আজিজকে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় বদলী করেন। সে সময় আবুল হাশেম সাহেব চাকুরীর সুবাদে পুনরায় চট্টগ্রামে বদলী হন। সম্ভবতঃ তখন তিনি শিক্ষা সমিতির সেক্রেটারীর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। বৃটিশ সরকার তখন আবুল হাশেম খান সাহেবকে খান সাহেব উপাধিতে ভূষিত করেন। পরবর্তীতে তাঁর কর্মদক্ষতার যথার্থতা মূল্যায়নে চাকুরী জীবনের শেষ দিকে ১৯৩৪ সালে তাকে খান বাহাদুর উপাধিতে সমাসীন করেন। মোবারক আলী সাহেব ১৯১৫ সাল থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত সরকারী মুসলিম হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক থাকাকালে ভিক্টোরিয়া ইসলামীয়া ছাত্রাবাসে বসবাস করতেন। তখন এ ছাত্রাবাসের সুপারেন্টডেন্ট ছিলেন বলে তাঁর রচিত আমার জীবন স্মৃতি'তে তিনি উল্লেখ্য করেছেন।

ফলে জামাতে আহমদীয়ার এ ত্রিরত্নের চট্টগ্রাম শহরের সুধী মহলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পৃক্ততায় মুসলিম এডুকেশন সোসাইটিতে কাজ করার সুবাদে তাদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। মুসলমান সমাজে বৈষয়িক শিক্ষা বিস্তারের সাথে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের শিক্ষানুসারে আখেরী জামানায় আবির্ভূত যুগ ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার শিক্ষাও তাঁরা সম্প্রচার করেছেন। প্রকৃত মুসলমান হওয়ার পথেরদিশা দান করেন। ১৯১৫ সালে মোবারক আলী সাহেব কর্তৃক এডভোকেট আব্দুস সাত্তার সাহেবের বাড়ীতে কাদিয়ানের বিশিষ্ট আলেম মাওলানা হাকিম খলিল আহমদ মুঙ্গেরী সাহেবের বক্তৃতামালায় আয়োজিত তবলীগি অনুষ্ঠানে চট্টগ্রামের যে সকল ধর্মপ্রাণ বিশিষ্টব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তারা সকলেই মুসলিম এডুকেশন সোসাইটির সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ফলে সে সময় চট্টগ্রাম শহরের শিক্ষিত মহলে জামাতে আহমদীয়ার শুভ পরিচিতির প্রবাহ বিরাজ করে। পার্থিব কারণে ইমামুজ্জামানের শিষ্যত্ব গ্রহণের সৌভাগ্য তাদের না হলেও অনেকে আহমদীয়াতের সত্যতা উপলব্ধি করতেন।

বলাবাহুল্য, ১৯২৯ সালে মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তখন প্রফেসার আব্দুল লতিফ সাহেব এ সমিতির একজন সক্রিয় কর্মী। কবি সেদিন গৌরবদীপ্ত অনুষ্ঠানে তাঁর অমুল্য অভিভাষণে সমিতির কর্মকান্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন–"আমি স্মরণ করি সেই বিরাট পুরুষকে যার কীর্তি শুধু তাঁকে মহিমান্বিত করেনি, আপনাদের চট্টলবাসী মুসলমানদের–তথা বাঙলার সারা মুসলিম সমাজকে নর-নারী নির্বিশেষে মহিমান্বিত করেছে। তিনি আপনাদেরই এবং আমাদেরও পূণ্য শ্লোক মরহুম খান বাহাদুর আব্দুল আজিজ সাহেব। শাহজাহানের তাজমহল গড়ে উঠেছিল শুধু মমতাজের ভালবাসাকে কেন্দ্র করে, তাজমহল সুন্দর। কিন্তু এই আত্মভোলা পুরুষের তাজমহল গড়ে উঠেছে সকল কালের সকল মানুষের বেদনাকে কেন্দ্র করে। এ তাজমহল শুধু Beautiful নয়, এ Sublime মহিমাময়।

আপনাদের ইসলামাবাদ হোক ওরিয়েন্টাল কালচারের পীঠস্থান–আরাফাত ময়দান। দেশবিদেশের তীর্থ-যাত্রী এসে এখানে ভিড় করুক। আজ নব জাগ্রত বিশ্বের কাছে বহু ঋণী আমরা, সে ঋণ আজ শুধু শোধই করব না–ঋণ দানও করব, আমরা আমাদের দানে জগতকে ঋণী করব এই হোক আপানাদের চরম সাধনা। হাতের তালু আমাদের শূণ্য পানেই তুলে ধরেছি এতদিন, সে লজ্জা আজ আমরা পরিশোধ করব। আজ আমাদের হাত উপুর করবার দিন এসেছে। তা যদি না পারি সমুদ্র বেশি দুরে নয়, আমাদের এ লজ্জার পরিসমাপ্তি যেন তারি অতল জলে হয়ে যায় চিরদিনের তরে। আমি বলি, রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতনের মত আমাদেরও কালচারের সভ্যতার জ্ঞানের সেন্টার বা কেন্দ্রভুমির ভিত্তি স্থাপনের মহৎ ভার আপনারা গ্রহণ করুন–আমাদের মত শত শত তরুণ খাদেম তাদের সকল শক্তি আশা-আকাঙ্ক্ষা জীবন অঞ্জলির মত করে আপনাদের সে উদ্যমের পায়ে অর্ঘ্য দেবে।

প্রকৃতির এই লীলাভুমি সত্যি সত্যিই বুলবুলিস্তানে পরিণত হোক-ইরানের শিরাজের মত। শতশত সাদি, হাফিজ, খৈয়াম, রুমী, জামী, শমশি-তবরেজ এই সিরাজবাগে এই বুলবুলিস্তানে জন্মগ্রহণ করুক। সেই দাওয়াতের আমন্ত্রণের গুরুভার আপনারা গ্রহণ করুন। আপনারা রুদকির মত আপনাদের বদ্ধ প্রাণধারাকে মুক্তি দিন। (মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা লেখা থেকে উদ্ধৃত) বলাবাহুল্য কবি নজরুলের সেই আশা আকাংখায় চট্টগ্রাম আজ জামাতে আহমদীয়ার ফলে ভিন্নরূপ বুলবুলিস্তানে পরিণত হয়েছে। রূহানীয়তের বাগান সৃষ্টি হয়েছে।

কবি নজরুল ইসলাম চট্টগ্রামে তখন কিছু দিন আব্দুল আজিজ সাহেবের বাড়ী 'আজিজ মঞ্জিলে অবস্থান করেন। সে সময় তিনি রচনা করেন তার অমর কাব্যগ্রন্থ 'সিন্দু হিন্দোল'-এর কবিতাগুলি, 'চক্রবাক'-এর কবিতাগুচ্ছ এবং 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি'-অমর কবিতা। মরহুম আব্দুল আজিজের স্মরণে লিখেন 'বাংলার আজীজ' কবিতা। সিন্দু হিন্দোল কাব্যগ্রন্থ নজরুল উৎসর্গ করেন আব্দুল আজিজের সুযোগ্য দৌহিত্র ও দৌহিত্রী ভাইবোন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হাবিবুল্লাহ্ বাহার ও কবি সামসুন্নাহার মাহমুদের নামে।

শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি আজ তাঁর গৌরবোজ্বল কর্মকান্ডের নিরব সাক্ষী। ঐতিহাসিক ভিক্টোরিয়া ইসলামিয়া হোষ্টেল দেশবরেণ্য বহু ব্যক্তির বিদ্যা দানের সহায়ক কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃত। চট্টগ্রাম নাইট কলেজ অধুনা সরকারী সিটি কলেজ, ওমেন্স কলেজ অধুনা সরকারী মহিলা কলেজ, এম ই এস কলেজ অধুনা ওমরগনি এম ই এস কলেজ, চট্টগ্রাম আইন কলেজ এবং এম ই এস হাই স্কুল এ সোসাইটি কর্তৃক প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে শিক্ষা বিস্তারে অনস্বীকার্য অবদান রেখে আসছে। *(সূত্র ঃ শতবার্ষিকীর স্মারক গ্রন্থ মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি, চট্টগ্রাম)।*

ছাত্রজীবনে প্রফেসার আব্দুল লতিফ সাহেবের শিক্ষা গ্রহণ ও সান্নিধ্য লাভের যাদের সৌভাগ্য হয় তারা কখনও তাদের উত্তম মানুষ গড়ার কারিগর শ্রদ্ধাভাজন এ শিক্ষককে ভুলতে পারেনি। ভট্টাচার্য বাবু নামে তার একজন ছাত্র যিনি পরবর্তীকালে চট্টগ্রাম কলেজের রসায়ন বিভাগের শিক্ষক ছিলেন, তিনি তার ছাত্র জীবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শ্রদ্ধাভাজন এ শিক্ষককে স্মরণ করেন।

এ প্রসঙ্গে প্রফেসার আব্দুল লতিফ সাহেবের সুযোগ্য নাতী প্রফেসার মীর মোবাশ্বের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর বাংলাদেশ বলেন– প্রফেসার আব্দুল লতিফ সাহেবের এক প্রসিদ্ধ ছাত্রের একটি লেখা ষাট দশকে আমি অবজারভার পত্রিকায় পড়ি। ভট্টাচার্য বাবু নামে এ ছাত্র তখন পেরেড মাঠের কোনে পাহাড়ের নিচের দোতলা বাসায় বসবাস করতেন। তিনি প্রাতঃভ্রমণে কাতালগঞ্জে নানা'র দরজায় এসে টোকা দিতেন। প্রফেসার সাহেব বেড়িয়ে আসলে দুজনে ষোলশহর রেল লাইন পর্যন্ত হেঁটে যেতেন। ফেরার পথে নানা তার বাসায় চলে গেলে ভট্টাচার্য বাবু নিজের ভবনে চলে যেতেন। দুজনের মধ্যে এ সময়টুকুতে কোনই কথাবার্ত হতো না। এ রকম অনেক দিন চলে তবুও কোন কথাবার্তার প্রয়োজন হয়নি। ছাত্র তাঁর শিক্ষকের এ ভ্রমণ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন- বন্ধুত্ব যেখানে গভীর ভাষা সেখানে নিরব। অর্থাৎ কথা না বলেই একজন আর একজনের মনের ভাব বুঝতে পারে। মমতা ও সখ্যতার এক আবেগ সর্বক্ষণ তাদের মাঝে বিরাজ করে। গভীর আন্তরিকতার দানা বাঁধে। আব্দুল লতিফ সাহেব স্বল্পভাষী ও মিষ্টি স্বভাবের এমন আদর্শবান মানুষ ছিলেন।

মানবতা ও পরোপকারের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত মিলে প্রফেসার আব্দুল লতিফ সাহেবের জীবনে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের আপনজন সুখে দুঃখে সবাই সুজন। মানুষের দুঃখ কষ্ট লাঘবে সদা-ই তাঁর হাত প্রশস্ত ছিল। বিশেষতঃ বাংলার গ্রামেগঞ্জের সরলমনা আহমদীদের প্রতি তাঁর গভীর মমতাবোধ ও সহমর্মিতা ছিল। তাই তাদের দুঃখ কষ্টে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। সমস্যা সমাধানে নিরলস কাজ করেছেন। আহমদী ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া প্রতি তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি সকলকে লেখাপড়ায় উদ্বুদ্ধ করতেন। বিভিন্নভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। বিশ দশকে চাঁদপুরের ছেলে মোহাম্মদ জিন্নাত আলী ভূঞা এবং সিলেটের ছেলে আব্দুল মতিন তাঁর স্নেহস্পর্শেই চট্টগ্রাম বসবাস করেন। জিন্নাত আলী ভূঞা তখন চট্টগ্রাম সরকারী স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তিনি কর্মজীবনে সরকারী হাই স্কুলের শরীর চর্চা শিক্ষক হন। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলসহ বিভিন্ন প্রসিদ্ধ স্কুলে শিক্ষকতার সর্বশেষে সাবেরা সোবহান সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ষাট দশকে অবসর গ্রহণ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি জামাতের কাজে নিবেদিত ছিলেন। ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন তিনি।

প্রফেসার আব্দুল লতিফ সাহেব তাঁর সুহৃদ বন্ধুবর সরাইলের মীর সেকান্দর আলীর ছেলে মীর হাবিব আলীকে ১৯২৮ সাল থেকে নিজ বাড়ীতে রেখে চট্টগ্রাম কলেজে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীকালে তিনি মেয়ের জামাতা হন। চট্টগ্রাম কাতালগঞ্জ ও চকবাজার এলাকার ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার সুবিধার্থে তিনি নিজ ভূমিতে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কমলদীঘির পাড়ে অবস্থিত এ স্কুলটি আজ কাতালগঞ্জ সরকারী প্রাইমারী স্কুল নামে পরিচিত। তাঁর বাড়ীর কাজের ছেলে রহিম বক্সকে বসবাসের জন্য নিজ বাড়ীর কিয়দংশ ভূমি দান করে দেন। এ ভূমিতে রহিম বক্সের উত্তরাধিকারীরা বর্তমানে বসবাস করে আসছেন।

বিশ দশকের মাঝামাঝিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল এল বি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারের গৌরবোজ্জ্বল রেকর্ড সৃষ্টিকারী ভবিষ্যত সম্ভাবনাময় প্রতিভাবান যুবক ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কৃতিসন্তান আব্দুর রহমান খা আহমদীয়া জামাতে দীক্ষা গ্রহণের পর বঙ্গীয় আমীর আব্দুল লতিফ সাহেব তাকে পবিত্র কুরআন, হাদিস ও সুলতানুল কলমের জ্ঞানে একজন ধর্মপ্রাণ আদর্শ তবলীগ সৈনিক হিসেবে গড়ে তোলেন। এবং ধর্মের সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে উপদেশ দেন। শিষ্য তার এ গুরুর উপদেশকে শিরধার্য করে পার্থিব জীবনে প্রতিথযজ্ঞা হবার বাসনাকে বিসর্জন দিয়ে ইসলামে কাজে উদ্বুদ্ধ হন। বিদেশের বুকে আমেরিকায় ইসলাম প্রচারে অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন। ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। ফলে শ্রেষ্ঠ গুরুর শ্রেষ্ঠ শিষ্য সৃষ্টি হয়। এমন অনেকেই আব্দুল লতিফ সাহেবের সংস্পর্শে অন্ধকার হতে আলোর সন্ধান লাভে ইহজীবনকে সার্থক ও সফল করতে সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

তার তবলীগি তৎপরতায় সে সময় চট্টগ্রামে বেশ কিছু সংখ্যক খোদার আশেক মসীহুজ্জামানের দলভুক্ত হয়েছিলেন। তারা আখেরী জামানায় আবির্ভূত প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের সত্যতা যথার্থভাবে উপলব্ধি করে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন চট্টগ্রামের স্থানীয় অধিবাসী নাজির আহমদ চৌধুরী ও আলতাফ হোসেন চৌধুরী প্রমুখ। আহমদীয়াতের কারণে তাদের উপর প্রচন্ড মোখালেফাত আসে। নাফনদীর বানের মত মোখালেফাতের বান ডাকে। কিন্তু আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের শিক্ষায় তারা ঈমানের পরীক্ষায় ধ্রুবতারা সম অবিচল ছিলেন। ফলে চট্টগ্রাম জামাত সুদৃঢ় হয়। বঙ্গীয় আমীরের নেতৃত্বে একটি আদর্শ জামাত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তখন জগবন্ধু নামে এক হিন্দু ব্যক্তি লতিফ সাহেবের বাড়ীতে প্রায়ই কাজ করতেন। সে ব্যক্তি আসলে বাড়ীতে বিশেষ কোন কাজ না থাকলেও সামান্য কাজেই তাকে নিয়োজিত রেখে দৈনিক মজুরী দেয়া হতো। উদ্দেশ্য তার পরিবারের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা। মানবতার এ দৃষ্টান্ত এবং তার প্রতি স্নেহস্পর্শের ব্যবহারে তিনি লতিফ সাহেবকে খুবই ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। ধর্মগুরু ও ঋষি পুরুষ হিসেবে শ্রদ্ধাবনত ছিলেন। অবশেষে গুরুর শিক্ষায় এ হিন্দু ব্যক্তি আহমদীয়াতের সত্যতা উপলব্ধি করে বয়াত গ্রহণ করে। প্রফেসার সাহেবের মৃত্যুর পর নাজির আহমদ চৌধুরী ছিলেন চট্টগ্রাম জামাতের প্রেসিডেন্ট। তিনি এ জামাতের অগ্রযাত্রার প্রবাহমান ধারা বজায় রাখেন। (চলবে)

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

লেবাননে ইসরাঈলের অন্যায় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে

হুযূর (আইঃ)-এর

প্রতিক্রিয়া ও সতর্কবাণী

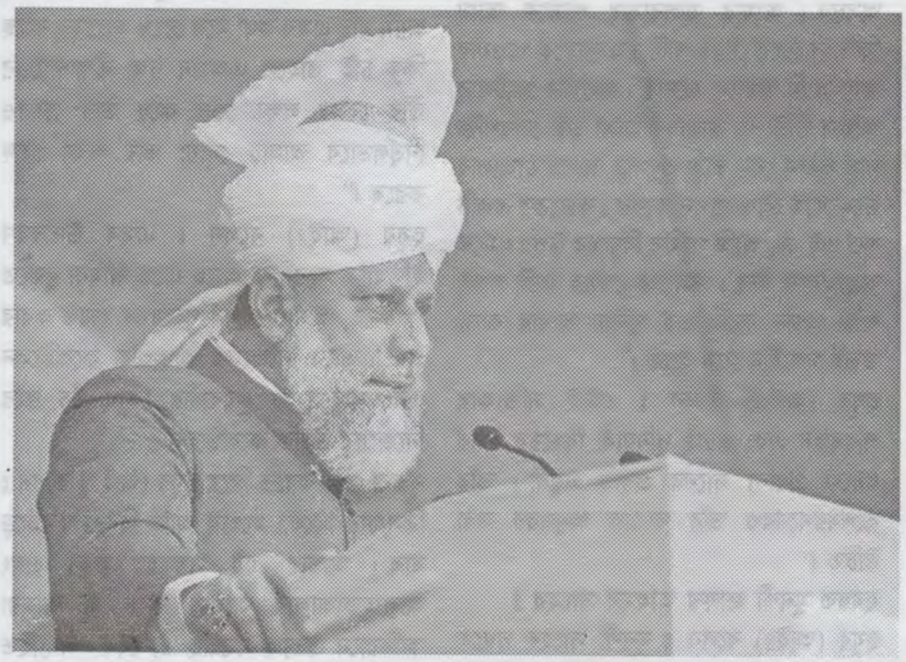

২৮ জুলাই ২০০৬ তারিখে ৪০ তম জলসা সালানা ইউ. কে-এর উদ্বোধনী ভাষণে হুযূর (আইঃ) সমস্ত আহমদীদের সম্বোধন করে বলেন,–"জগতকে বলতে হবে তোমরা সম্মিলিতভাবে দরিদ্র দেশগুলোর এবং মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর অধিকার হরণ করছো এবং তাদের ধ্বংস করতে চেষ্টা করছো। আজ ইসরাঈল নিরীহ নাগরিক, শিশু, নারী ও বৃদ্ধাদেরকে হত্যা করছে আর কয়েকটি পশ্চিমা দেশ একে সঙ্গ দিচ্ছে এবং একে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। আর এ যুদ্ধকে অধিকার সংরক্ষণের নিজের নিরাপত্তা, আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে। এ যুদ্ধ অধিকার রক্ষার যুদ্ধ নয় বরং অধিকার হরণের নামান্তর, অত্যাচার অনাচার করে সমস্ত পরিবেশকে বিষাক্ত করার নামান্তর, আলোকে অন্ধকারে পরিণত করার নামান্তর। যদুর পাপ মধুর ঘাড়ে চাপিয়ে নিরীহ নিরপরাধ নারী এবং শিশুদের বিলাপ ও আহাজারিতে রত করানোর নামান্তর। জগতকে বলতে হবে, তোমাদের পরকালের চিন্তা নেই বলে তোমরা মনে করছো এসব আহাজারি ও কান্নাকাটি ফলপ্রসূ হবে না। তোমাদের ধারণা ভুল। আমরা ঈমান রাখি, নিপীড়িত-নির্যাতিতদের দোয়া এবং আহাজারি কখনো বিফল হয় না। তাই এসব অত্যাচার, অনাচার বন্ধ কর আর নিজেদের দাম্ভিকতা আর নির্লজ্জতাকে পরিত্যাগ কর।

আজ প্রতিটি আহমদীকে নিজ পরিমন্ডলে এসব কথা জানাতে হবে আর সবাইকে বলতে হবে, এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর। কেননা এ অনাচার কেবল একটি বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে।"

আমীর,
জামাত আহমদীয়া
বাংলাদেশ

প্রিয় আমীর সাহেব,
আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

গত ১৩ জানুয়ারী, ২০০৬ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আইঃ) কাদিয়ানে মসজিদে আকসায় জুমুআর খুতবা প্রদান করেন। হুযূর (আইঃ) সূরা আল-জুমুআর ৪নং আয়াত তিলাওয়াত করেন।

"এবং (তিনি তাহাকে আবির্ভূত করিবেন) তাহাদের মধ্য হইতে অন্য লোকদের মধ্যেও যাহারা এখন পর্যন্ত তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই। তিনি মহা পরাক্রমশালী পরম প্রজ্ঞাময়।"

হুযূর (আইঃ) বলেন, মহানবী মুহাম্মদ (সঃ) এর আধ্যাত্মিক প্রভাবের ফলে সাহাবীরা সকল প্রকার পাপকর্ম থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। প্রত্যেক অনাচার, চুরি, ব্যভিচার, জুয়া, মিথ্যাচার, মদ্যপান এবং রক্তপাত তাদের মধ্য থেকে এমনভাবে দূরীভূত হয়েছিল যেন তাদের মধ্যে এসব পাপকাজ কখনওই ছিল না। তদুপরি এ সকল পাপকর্মের স্থলে পূণ্যময় সৎগুণাবলী তাদের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছিল। ইবাদতের প্রতি প্রবল অনুরাগ এবং আত্মত্যাগের তীব্র বাসনা তাদেরকে নতুন মানুষে পরিণত করেছিল। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন এবং তারা মুহাম্মদ (সঃ) এর ভালবাসা ও আনুগত্যে তাদের জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। মুহাম্মদ (সঃ) এর জন্য তাদের এমনই ভালবাসা ছিল যে তারা তাঁর (সঃ) ওজু করা পানিও মাটিতে পড়তে দিতেন না।

হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) বলনে যে, "আমি দেখছি যে, যারা আমার হাতে বয়াত করেছেন তারা তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করছেন। এবং আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে এমনসব পবিত্র চিত্ত ব্যক্তিদের দান করেছেন যারা পরিপূর্ণ সত্যবাদী।" হুযূর (আইঃ) অতঃপর প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) এর কয়েকজন সাহাবীর উদাহরণ তুলে ধরেন যাদের জীবন বয়াত করার পর সম্পূর্ণরূপে বদলে গিয়েছিল।

হযরত নবাব মোহাম্মদ আলী খান সাহেব (মালাইর কোটলা) ঃ

হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ তিনি মালাইর কোটলার জমিদার ছিলেন এবং পূর্ব থেকেই একজন ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। বয়াতের পর মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সংস্পর্শে এসে তাঁর এইসব গুণাবলী আরও পরিশীলিত ও উন্নত হয়। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) তাঁর বিষয়ে লিখেন যে, "যখনই তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন, আমি দেখেছি যে, তিনি অত্যন্ত যত্নের সাথে নামায আদায় করেন। গভীর মনোযোগের সাথে দোয়া করেন।" নবাব সাহেব একবার তার ভাইকে লেখেন ঃ "আমি মালাইর কোটলা ছেড়ে কাদিয়ানে হিজরত করেছি। এখন আমার পক্ষে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। আমার ভালবাসার পাত্রকে আমি কিভাবে ছেড়ে যেতে পারি। আল্লাহ্‌কে পাওয়ার জন্য আমি এখানে এসেছি। মালাইর কোটলার আমার ভাইদের আল্লাহ্‌তাআলা এই বোধশক্তি দান করুন যেন তারা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌তাআলার উদ্দেশ্যেই জীবনযাপন করেন। বয়াতের একটি শর্ত এই যে, আমি পার্থিব বিষয়ের উপর ধর্মকে অগ্রাধিকার দিব। ঈমানের ক্ষেত্রে আমি যতই শক্তি অর্জন করছি এই দুনিয়া আমার কাছে ততই মূল্যহীন মনে হচ্ছে।"

হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ এটাই সত্যিকার পরিবর্তন এবং এটাই দুনিয়াবী বিষয়ের উপর ধর্মকে প্রধান্য দানের প্রকৃত নমুনা। তাঁর বংশধরগণেরও তাঁর পদাংক অনুসরণ করা উচিত।

হযরত মুনশী জাফর আহমদ সাহেব ঃ

হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ মুনশী সাহেব সম্বন্ধে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) বলেছেন ঃ "এই ন্যয়নিষ্ঠ শান্ত স্বভাব বিশিষ্ট যুবা মানুষটি পরিপূর্ণভাবে আত্মউৎসর্গিত এবং গভীর বোধশক্তি সম্পন্ন। তাঁর মধ্যে ধৈর্য, ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং সত্যের গভীর আকর্ষণ রয়েছে। তিনি আল্লাহ্ ও তার রসূলকে সত্যিকার অর্থেই ভালবাসেন।

হযরত মুনশী আব্দুর রহমান (কপুরথলা) ঃ

হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ হযরত মুনশী সাহেবের প্রতিদিনের লেনদেন লিখে রাখার অভ্যাস ছিল। একদিন পুরনো হিসেব পত্র দেখতে গিয়ে লক্ষ্য করেন যে তিনি এক লোকের নিকট ৪০ রুপী দেনাদার। ৪০ বছর আগে তিনি এই টাকা ধার নিয়েছিলেন। তিনি সাথে সাথে ঐ টাকা ডাকযোগে কপুরথলায় পাঠিয়ে দেন। ঐ লোকটি আহমদী ছিলেন না। টাকা পেয়ে তিনি মসজিদে গিয়ে মুনশী সাহেবের বিশ্বস্ততার বিষয়ে বলেন যে, এই টাকার কথা তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন। অথচ মুনশী সাহেব তা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

হযরত মুনশী অরোরা খান সাহেব ঃ

হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ একলোক মুনশী সাহেবকে তার চাকুরীকালে কখনও ঘুষ খেয়েছিলেন কিনা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "আমার সততা ও নিষ্ঠা এমন ছিল এবং এত অসুবধিা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে আমি সবরকম অসৎকর্ম থেকে মুক্ত থেকেছি যে, আমি যদি এসব কথা মনে রেখে আল্লাহ্‌র কাছে কিছু চাই তাহলে একজন দক্ষ তীরান্দাজের তীর যেমন লক্ষ্য ভেদ করে তার চেয়েও নির্ভুলভাবে আমার দোয়া তার লক্ষ্য ভেদ করবে।"

হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ এসব উদাহরণ ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে যাতে আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের পূর্ব পুরুষগণ বয়াত করার পর কিভাবে নিজেদের আত্মশুদ্ধি করেছিলেন এবং সাধুতা ও কুরবানীর কোন উঁচু স্তরে নিজেদের উন্নতি করেছিলেন।

খুতবা শেষ করতে গিয়ে হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ তিন/চার দিনের মধ্যেই আমি হিন্দুস্তান ছেড়ে যাব। আমার এই সফরের জন্য এবং আল্লাহ্‌তাআলার আশীষ বর্ষণ যা আমরা কাদিয়ানে প্রত্যক্ষ করেছি তা যেন অব্যাহত থাকে তার জন্য দোয়া করবেন। আমিন।

অনুগ্রহপূর্বক হুযূর (আইঃ) প্রদত্ত এই নির্দেশনা আপনার জামাতের সদস্যদের নিকট পৌঁছে দিন।

জাযাকুমুল্লাহ।
ওয়াস্সালাম
চৌধুরী হামিদুল্লাহ
উকিল আ'লা
তাহরীকে জাদীদ
আঞ্জুমান আহমদীয়া, পাকিস্তান
তারিখঃ বুধবার, জানুয়ারী ২০/০১/ ২০০৬ইং
অনুবাদক ঃ বশীর উদ্দিন আহমদ

আমি মুসলমান–আমার ধর্ম ইসলাম

গত ১৬ই আগষ্ট ২০০৬ থেকে রাজধানী ঢাকার মুক্তাঙ্গনে হয়ে গেলো ইসলামী ঐক্যজোটের অবস্থান কর্মসূচী–নির্দিষ্ট ক'টি দাবীর প্রেক্ষিতে। এ জোটের নেতৃত্বে রয়েছেন একজন বর্ষীয়ান হাদীসবেত্তা। হাদীসবেত্তা বা শায়খুল হাদীস মানে হ'ল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী, ব্যক্তিজীবন, কর্মজীবন ও অনুসারীদের জন্য রেখে যাওয়া বাণীসমূহ সম্পর্কে যিনি বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী। বাল্যকাল থেকে শুরু করে মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বা তাঁর ইন্তেকালের পর, তাঁর খলীফাগণ বা তৎপরবর্তী সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউ কি কখনও আরবের কোন খোলা মাঠে কোন শাসকের কাছে এমন দাবী আদায়ের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন কি না-তা' আমার জনা নেই। এ আদর্শ বা নমুনা কোথা হতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রচারিত শান্তির ধর্ম ইসলামে আমদানী হলো? এ আমদানী কি আল্লাহ্‌র তৌহীদ প্রতিষ্ঠা বা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর শিক্ষা বা আদর্শ প্রতিষ্ঠার স্বার্থে করা হচ্ছে? হাদীস বিশারদ ইসলামী মুরুব্বীদের মাঝে কেউ কি এরূপ কর্মের কোন রেফারেন্স 'সিহাহ্ সিত্তা'র কোন হাদীস থেকে দিতে পরবেন? তা'হলে কোন্ ইসলামের মাঝে অবস্থান করে আমরা অন্ধের মত এ মুরুব্বীদের পেছনে 'জিন্দাবাদ' বলে ধ্বনি দিয়ে চলেছি? আমরা কতিপয় তথাকথিত পথনির্দেশক (?) নেতাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের কাজের হাতিয়ার হচ্ছি না তো? এ বিচারের ভার বুদ্ধিমান পাঠকদের কাছে আমার। আমার বিশ্লেষণে নাখোশ না হয়ে আল্লাহ্কে ভয় করে গভীরভাবে তলিয়ে দেখবেন-এ আমার প্রত্যাশা। দেশের রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হওয়ার জন্য ইসলামের সুন্দর শিক্ষাকে কলুষিত করা কি ন্যায় সঙ্গত হবে?

আমি নিজেকে মুসলমান বলি। আমি আল্লাহ্কে এক ও অদ্বিতীয় জানি, তাঁর প্রেরিত পুরুষ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আমি আল্লাহ্‌র রসূল ও নবী এবং সঠিক আল্লাহ্ প্রাপ্তির পথের আলোকবর্তিকা হিসাবে মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করি। আমি কুরআন মজীদকে মানবকুলের হেদায়াতের জন্য সর্বশেষ এবং এক পূর্ণ ঐশীবাণী বলে বিশ্বাস করি। আমি নিষ্ঠা ও মনোযোগের সাথে বিনা ব্যতিক্রমে প্রত্যহ পাঁচবার নামায পড়ি-প্রত্যেক প্রভাতে কুরআন শরীফের কিছু অংশ পাঠ করি। রমজান মাসে রোযা রাখি। সাধ্যমত রিযক থেকে নিয়মিত আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করি। মিথ্যা কথা বলি না–মিথ্যাবাদীদের ঘৃণা করি, তাদের সংসর্গ পরিহার করে চলি। আমি আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী, ফেরেশ্‌তাগণে, ঐশী কিতাবসমূহে, সকল নবী-রসূলে এবং তকদীরে বিশ্বাসী। আমি পরকাল ও শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাসী এবং মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে বিচার দিবসের প্রধান ও একমাত্র বিচারক হিসাবে বিশ্বাস করি। আমি ইসলামের 'আরকানে খামছা' বা পঞ্চস্তম্ভে বিশ্বাসী ও অনুশীলনকারী।

আমি খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক শেষ যুগে ইসলামের সংস্কারক রূপেআবির্ভূত ভারতের পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্যের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক গ্রামে জন্মলাভকারী দাবীকারক মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ হিসাবে বিশ্বাস করি এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামাতের নির্বাচিত খলীফার হাতে বয়াত করে নিজে একজন খাঁটি মুসলমান, উম্মতে মুহাম্মদ (সঃ)।

তাই, আজ আমার প্রশ্ন–এ কাজগুলো যে বা যেসব মানুষ করে, তাকে সাধারণ জনগণ কি অমুসলিম বলে? কি বা কোন্ সনদে এসব ধর্মবেত্তা মুরুব্বীরা এদেরকে অমুসলিম বলে প্রচার করে নিজের স্বার্থ হাসিলের প্রয়াস পায়? এ বিশ্বাস আমার মৌলিক অধিকার। আমার এ অধিকার কুরআন হাদীস সম্মত এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সম্মত। আমার বিশ্বাস আমার আত্মার, এ বিশ্বাস ধারণ করার অধিকার শুধুই আমার নিজের। এতে অন্য কোন ব্যক্তির, সরকারের বা রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করার অধিকার আছে কি? আমার এ আন্তরিক বিশ্বাস ধারণে কারো কোন সম্মতি গ্রহণ করার কি কোন অবকাশ আছে বা এ বিষয়ে কারো বিরূপ সিদ্ধান্ত নেয়ার কি কোন অধিকার আছে?

আমার এ বিশ্বাস স্পষ্ট, কপটতামুক্ত। দেশের সরকারের আমার এ বিশ্বাসে হস্ত ক্ষেপ করার কি অধিকার আছে? আমি কি সরকারের ঘোষণাপত্রের বলে মুসলমান? বাংলাদেশে বসবাসকারী সকল আদিবাসীদেরকে কি সরকারের ঘোষণায় মুসলমান করা যাবে? যদি তা' না হয়, তবে কেন সরকার আমার (আহমদী মুসলমানদেরকে) এ মৌলিক অধিকারে হস্ত ক্ষেপ করবে–একদল বিভ্রান্ত, নেতৃত্বলোভী মানুষদের ভুল ব্যাখ্যায়? যে সরকার ঘোষনা বা আইন প্রয়োগ করে আমার এ বিশ্বাসের অধিকার দেয়নি– কেন বা কেমন করে সরকার আমার এ অধিকার হরণ করবে? এখানে সবার ভাবার বিষয় রয়েছে–আল্লাহ্ কি প্রকৃতই সৃষ্টিকর্তা বা আমাদের সবকিছুর মালিক, না আমাদের ধর্মীয় মুরুব্বীরা খোদার খোদায়ী পরিচালনার সহশক্তি? আল্লাহ্ কি তাদের পরামর্শে পৃথিবী পরিচালিত করেন? আল্লাহ্ কি মহা ঐশী গ্রন্থ কুরআনে এসব বিষয়ে সমাধান দেননি?

কুরআন শিক্ষা -দেয় আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সঃ) এর অনুগত হও, অনুসরণ কর এবং যারা হুকুম দেয়ার অধিকারী তাদেরও। আর ইসলামের নামে কিছু কট্টর পথহারা লোক সরকারকে তাদের অনুসরণে বাধ্য

করার হুমকী দেয়। আল্লাহ্ বলেন, তোমরা বিদ্রোহ করো না। আর এসব মানুষগুলো নিজেদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লাঠি মিছিল করে, মানুষের চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে সরকার ও ব্যক্তি সম্পদ বিনষ্টকরে দলগতভাবে। ব্যস্ত রাখে সরকারের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে। অথচ ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক সমাজে অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি মারাত্মক অপরাধ।

পাঠক! উন্মুক্ত হৃদয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে-কুরআন মজীদ নামের ঐশী কিতাবটি আমাদের উলামাকূলের কাছে আজ এক অপূর্ণ শিক্ষা। কি মারাত্মক বিষয়!

বাংলাদেশ এবং কোন কোন দেশের কোন কোন মুসলিম নেতারা আল্লাহ্ ও রসূল (সঃ) এবং ইসলামকে সার্বজনীন মনে করে না। তাদের কেউ কেউ মনে করে আল্লাহ্, রসূল (সঃ) এবং ইসলাম-তাদের দেশের বিষয়, জাতীয় বিষয়। আমার তো মনে হয়, আমার প্রিয় রসূল হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এ দৃশ্য দেখলে নিজেই বলতেন-আমার উলামাকূল আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআনকে পেছনে ফেলে দিয়েছে।

আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখেছি, পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের অত্যাচার, নৃশংসতা এবং উদ্ভট দেশপ্রেম প্রত্যক্ষ করেছি। এখনও প্রত্যক্ষ করছি দেশের কৃষ্ণপক্ষকে, এসব দেখে অসহায় ভাবছি নিজেকে। ভেবে আঁতকে উঠছি, কবে না জানি শুনি-এরা ঘোষণা করবে-বাংলাদেশটাকে আমরা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করিনি; আমাদেরও প্রেসিডেন্ট জেনারেল মোশাররফ। এ বাংলাদেশে জন্মলাভকারী, বসবাসকারী, দেশপ্রেমিক আহমদী মুসলমানরা মুসলমান নয়। একাত্তরে যাদের দোসররা কলেমা শাহাদত নিজে পড়তে জানতো না, যে দোসররা বিনোদ বিহারী পালকে বিহারী মুসলমান ভেবেছে, তারা ইসলামের নামে আমাদের কত সম্পদ লুট করেছে, কতো মা-বোনের ইজ্জতহানি করেছে! সে সব সুবিধাবাদী দোসররাই আবার পঁয়ত্রিশ বছর পর আমাদের বাংলাদেশটাকে পাকিস্তান বানানোর পাঁয়তারা করে আহমদী মুসলমানদেরকে সরকারীভাবে অমুসলিম ঘোষণার অনৈসলামিক দাবী তুলছে।

এ যাবত আমাদের দেশে কতিপয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ইসলামের নামে যে সব অনৈসলামিক কাজ করছে, এসব হাদীসবেত্তা, মুফতীদের নেতৃত্বে-তাই বলে আমিও কি সরকারের কাছে ওদেরকে অমুসলিম ঘোষণার দাবী তুলব? আমার ভাবতে অবাক লাগে-কি করে এসব বিভ্রান্তরা ইসলাম ধর্মকে ন্যাশনালাইজড করে ফেলছে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে।

আমি জানি এদেশের সাধারণ মানুষ ধর্মভীরু, কিন্তু ধর্মান্ধ নয়। আজ যারা আহমদী মুসলমানদেরকে অমুসলিম বানানোর ফন্দিফিকির করছেন-তারা আমাদের সাধারণ ধর্মভীরু মানুষদেরকে ভেড়া বানানোর কাজে লেগে পড়েছেন।

তাই, দেশের আপামর জনগণকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। নতুবা পরবর্তী প্রজন্ম এসব কাজের জন্য আমাদেরকে ধিক্কার দেবে। কুরআন মজীদে আল্লাহ্ বলেন, তোমরা মানুষদের মাঝে (ইসলাম সম্পর্কে) প্রচার কর। আর আমাদের মূফতি-হাদীবিশারদরা বিদেশ থেকে অর্থ পেয়ে দেশের মুসলমানদেরকে-যারা মানুষকে ইসলামের দাওয়াতের কাজে জীবনপন লড়াই করছে সেসব (আহমদী মুসলমানদেরকে) সরকারীভাবে অমুসলিম ঘোষণার দাবী তুলছে। আজ মুসলমানরা ইহুদীদের হাতে মার খাচ্ছে, আফগানিস্তানসহ বেশ ক'টি দেশে মুসলমানরাই মুসলমানদেরকে গুলি করে শহীদ করছে। কই, এসব বিষয় নিয়ে তো রাস্তায় মিছিল হয়ে না, দল বেঁধে প্রধান মন্ত্রী বা জাতীয় সংসদের স্পীকারের কাছে স্মারকলিপি দেয়ার হিড়িক দেখা যায় না? ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার ধোঁয়া তুলে বিচারক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষদের বোমা-গ্রেনেড মেরে হত্যার ব্যাপারে এসব আলেমকূলের কোন মাথাব্যথা নেই। এভাবে মানুষ হত্যা, কারো সম্পর্কে মিথ্যা কথা প্রচার করে ঘৃণা বিদ্বেষ ছড়ানো কি ইসলাম সম্মত বা ইসলামী শাসন কায়েমের পদ্ধতি? আমাদের সরকার কি এসব বিষয় তলিয়ে দেখছেন? প্রকৃত গণতন্ত্র তো মানুষের কল্যাণের জন্য, দেশের জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। যদি এমনটি না করা যায়-তাহলে কি করে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে?

হাদীস নিয়ে যখন আলোচনাটা শুরু করেছিলাম তখন আসুন আপনাদের সুবিধার্থে একটা হাদীস তুলে ধরি।

হাদীসটি হলো ঃ-

وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى صَلٰوتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَاَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذٰلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِىْ لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهٖ فَلَا تُخْفِرُوا اللهَ فِىْ ذِمَّتِهٖ — رواه البخارى

অর্থাৎ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হযরত রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের মত নামায পড়ে, আমাদের কিব্‌লা কা'বাকে কিব্‌লা হিসেবে গ্রহণ করে এবং আমাদের যবেহ করা পশুর মাংস খায়, সে অবশ্যই মুসলিম। তার জান, মাল ও ইজ্জত সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না। -বুখারী (মেশকাত শরীফ, প্রথম জিল্‌দ, পৃঃ ২০, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার ঢাকা-অষ্টম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩)

পাঠক! চিন্তা করে দেখুন-আমাদের উলামাগণ হাদীসসমূহের অনুবাদ করেন ঠিকই, কিন্তু বিষয়টি পড়েও দেখেন না-কি অনুবাদ করেছেন। তারা আন্দোলন করার সময় আল্লাহ্ ও রাসূল (সঃ)-এর আদেশ নিষেধের তোয়াক্কা করেন না। আর আমাদের মানুষগুলো এতই সহজ সরল যে, আলেমদের চলনবলনের প্রতিই তারা অগাধ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে গুণাহ্‌তে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন। [চলবে]

–আলহাজ্জ এ, কে রেজাউল করীম

ডেঙ্গু জ্বর

ডেঙ্গুজ্বর-প্রতিরোধেই প্রতিকার

বর্তমান সময়ে ভাইরাস জনিত রোগের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত হচ্ছে ডেঙ্গু জ্বর। ঢাকা শহর এর প্রকোপে প্রকম্পিত। ডেঙ্গ জ্বরের ভাইরাসটি বহন করে সাদাকালো ডোরাকাটা এডিস নামক মশা। বর্তমান বিশ্বে ২০০টির মতো দেশে ২৫০ কোটি মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। আর আক্রান্ত ৫-১০ কোটি লোকের মধ্যে ৫ লাখ ডেঙ্গু হেমোরেজিক রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

১৭৮০ সালে ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ আবিস্কৃত হয়। ১৯০৫ সালে বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত হন যে, এই রোগ এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। ১৯০৬ সালে নিশ্চিত হয় যে, এটি ভাইরাসজানিত রোগ। কিন্তু ভাইরাসটি পৃথকভাবে সনাক্ত করতে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত গবেষণা করতে হয়। পৃথিবীতে প্রতি বছর ১ কোটি লোক ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়। গত ১০-১৫ বছরে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে সবচে' বেশি রোগাক্রান্ত ছিল, ডাইরিয়া, তারপর শ্বাসতন্ত্রের সংক্রামণ এবং তারপরই ডেঙ্গু জ্বরের পরিসংখ্যান।

দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, মধ্য আমেরিকা, এবং আফ্রিকা মহাদেশে ডেঙ্গু জ্বরের প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যায় তবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে গ্রামাঞ্চলেও এর প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যায়। সাধারণতঃ এই জ্বরের প্রকোপ শহরে বেশী দেখা যায় তবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে গ্রামাঞ্চলেও এর প্রদুর্ভাব উল্লেখযোগ্য।

ডেঙ্গু ভাইরাস পৃথিবীতে বহু প্রাচীনকাল থেকেই রয়েছে। এই ভাইরাস নিধন করা খুবই দুরূহ। কিন্তু এর জীবন চক্রের একটি বাহক অর্থাৎ এডিস মশা নিধনের মাধ্যমে ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ কমিয়ে আনা সম্ভব। ডেঙ্গু জ্বরের জন্য তিনটি জিনিস প্রয়োজন ১। ভাইরাস ২। এডিস মশা ৩। মানুষ।

ডেঙ্গু ভাইরাস পৃথিবীতে সরাসরি মানুষের শরীরে ঢুকতে পারে না। এডিস মশাই ডেঙ্গু ভাইরাস বহন করে। এডিস মশার লালগ্রন্থিতে এই ভাইরাস বৃদ্ধি পায়। এডিস মশা মানুষকে কামড়ালে এই ভাইরাসের সংক্রামণ ঘটে।

ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ

- জ্বর আসার আগে শরীর দুর্বল, ম্যাজ ম্যাজ ভাব, হাঁচি থাকে
- শরীরের তাপমাত্রা ১০৪ক্ক-১০৫ক্ক ফারেনহাইট একটানা অধিক জ্বর থাকে।
- প্রচন্ড মাথা ব্যাথা, মাংসপেশী ও হাড়ে বিশেষ করে শরীরের পিছনের মেরুদন্ডে ব্যথা থাকে।
- বমি বমি ভাব
- চামড়ার নীচে কালচে ছোপ (রক্তপাত), দাঁতের মাড়ি, নাক দিয়ে রক্ত পড়া
- কালচে পায়খানা বা তাজা রক্তসহ পায়খানা
- মারাত্মক সংক্রমণে (হেমোরেজিক) ডেঙ্গু জ্বরে শরীরের আভ্যন্তরীণ অঙ্গে রক্তক্ষরণ, লিভার ও গ্ল্যান্ড ফুলে যেতে পারে।

ডেঙ্গু জ্বরের চিকিৎসা ঃ

ডেঙ্গু জ্বরের সুনির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নেই। কোন এন্টিবায়োটিক বা ভেকসিন আবিস্কৃত হয়নি। রোগীকে বিছানায় সম্পূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হবে। তাপমাত্রা অত্যধিক থাকলে প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খাওয়ানো যেতে পারে তবে অবশ্যই ডোজের অধিক নয়। তবে এসপিরিন বা ইবুপ্রুফেন জাতীয় ওষুধ খাওয়ানো যাবে না। এতে রক্তপাত বাড়তে পারে। রোগীর চিকিৎসার ব্যাপারে রেজিষ্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ জরুরী। প্রয়োজনে মারাত্মক লক্ষণ দেখা দিলে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। প্রথমবার একক ভাইরাসে আক্রান্ত ডেঙ্গু জ্বর অধিকাংশ ক্ষেত্রে ৭-১০ দিনের মধ্যে সেরে যায়।

রোগীকে সারাক্ষণ তদারকি করতে হবে। বিভিন্ন ল্যাবরেটরী পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অন্যান্য জ্বরের সাথে পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে। দ্বৈত ভাইরাস আক্রান্ত মারাত্মক হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বরে রক্তপাত ও রক্তসহ দেহরস ক্ষরণের জন্য রোগীর পানি শূন্যতা দেখা দিতে পারে। ফলে রোগীর শিরায় প্রয়োজনীয় স্যালাইন এবং রক্ত পরিসঞ্চলনের দরকার হতে পারে।

এই জ্বরে ষ্টেরয়েড ও হেপারিনের কোন প্রমাণিত উপকারিতা নেই।

রোগীর খাবার স্বাভাবিক, কোন বাছ-বিছার করার প্রয়োজন নেই।

বমি থাকলে রোগীকে ওরস্যালাইন দিতে হবে। জ্বর ভাল হলে ও ২ দিন পর্যন্ত পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।

কারণ, এ দু'দিনের মধ্যে রোগীর প্রচন্ড ব্যথা, কালো পায়খানা, চামড়া, নাক ও দাঁতের মাড়ি থেকে রক্তক্ষরণ, হামের মত গোটা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঠান্ডা হয়ে গেলে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে। রোগী যদি তিনদিন পর্যন্ত সুস্থ থাকে তবে কোন বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধ ঃ

ভাইরাস নির্মুল করা সম্ভব নয় তবে ভাইরাসের জীবন চক্রের শিকল ভাঙ্গা সম্ভব অর্থাৎ এর বাহক এডিস মশা দমনই হচ্ছে ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধের প্রধান উপায়।

বাসগৃহ ও আশপাশের ফুলের টব পরিত্যাক্ত কৌটা-নারিকেলে-বেলের মালা, থালা বাসন বা ভাঙ্গাপাত্র, গাড়ির টায়ার, ফ্রিজের বা এয়ার কুলারের জমে থাকা পানি ইত্যাদিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে। তাই এসব পানি জমার স্থলে ধ্বংস নিশ্চিত করতে হবে। বাড়ী ঘরও আশপাশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

মশারী ব্যবহার করতে হবে। এডিস মশা যেহেতু দিনেও কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমালেও মশারী টানাতে হবে।

ওষুধ ও ক্যামিকেল ছিটানোর মাধ্যমে মশা ও মশার লার্ভা ধ্বংস করতে হবে।

অতএব বর্তমান সময়ের মহামারি ডেঙ্গু জ্বরের আক্রমণ মোকাবিলা করতে হবে। সর্বাগ্রে প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রতি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

[সূত্র ১। ইন্টারনেট, ২। মেডিক্যাল টেক্সট্স ৩। জার্নালস]

–ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান

মহান ত্যাগের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসার লাভ

আমরা যদি ধর্মের ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখি আল্লাহ্তাআলা ১ লক্ষ ২৪ হাজার বা ২ লক্ষ ২৪ হাজার মহাপুরুষকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেন। তাঁদের প্রেরণের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীতে তাঁর একত্ববাদকে প্রতিষ্ঠা করা। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পূর্বে যত মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে তা সীমাবদ্ধ ছিলেন। তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বহু ত্যাগ তিতিক্ষা দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। শত্রুরা তাদের এ প্রলোভন দেখিয়েছিল যে, তোমাদের সুন্দর নারী দেয়া হবে এবং তোমরা যা চাও সব তোমাদের দেয়া হবে, তবুও এ সমস্ত কাজ থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে লও। কিন্তু শত্রুদের সামনে তাঁদের যে উত্তর ছিল তাহলো, "যদি আমাদের এক হাতে চাঁদ এবং আর এক হাতে সূর্যও এনে দাও তবুও খোদার অর্পিত দায়িত্ব পালনে বিমুখ হওয়া কখনও সম্ভব নয়। তাঁরা দুনিয়ার মোহ মমতা ভোগবিলাস পরিত্যাগ করে এবং বহু রক্তের বিনিময়ে খোদাতাআলার একত্ববাদের মানকে সমুন্নত রেখেছেন। আর শত্রুরা লাঞ্ছিত হয়েছে। ব্যর্থতার ইতিহাস তাদের সবসময় পাকড়াও করে রেখেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তআলা এ প্রসঙ্গে বলেন, 'কাতাবাল্লাহু লাআগলিবান্না আনা ওয়া রসুলী' যার অর্থ হলো আমি এবং আমার রসুলগণ অবশ্যই বিজয় লাভ করব। (৫৮ঃ ২২)

উপরোক্ত আয়াতটিতে আল্লাহ্তাআলা বিরুদ্ধবাদীদের সর্বকালের জন্য এক সুস্পষ্ট চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছেন যে, তোমরা তোমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী এ পৃথিবী থেকে আমার নাম মুছে ফেলার জন্য তোমাদের কর্মকান্ড অব্যাহত রাখ, আর আমি খোদা তোমাদের উপরও উত্তম এক মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করে রেখেছি। দেখবে আমার পরিকল্পনার উপর তোমরা কখনও সফলতা অর্জন করতে পারবে না। তোমাদের প্রতি সর্বকালের জন্য আমার এই আফসোস থাকবে যে, যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তাআলা বলেন, ইয়া হাসরাতান আলাল ইবাদে মাইয়াতিহিম মির রাসূলিন ইল্লা কানু বিহি ইয়াসতাহজেউন। অর্থাৎ পরিতাপ বান্দাগণের জন্য তাদের নিকট এমন কোন রসূল আসে নাই, যাঁর প্রতি তাঁরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে নাই। (৩৬ ঃ ৩১)

সুতরাং পূর্ববর্তী মহাপুরুষদের বিষয়গুলো নিয়ে যখন আমরা গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলে আমাদের সামনে খোদাতাআলার বিরুদ্ধবাদীদের উপর সফলতা অর্জন করার এক মহাঅস্তিত্ব খুঁজে পাই। আর তাহলো আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, যাঁর মাধ্যমে ধর্মের পূর্ণতা সাধিত হয়েছে। যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্তাআলার নিজ সত্তাকে নতুনভাবে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করতে এবং যাঁর মাধ্যমে নিজ সত্তার উপমা বর্ণনা দিয়েছেন, যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তাআলা বলেন, আল্লাহু নুরুস্সামাওয়াতে ওয়াল আরদ মাসালু নূরিহী কামিশকাতিন ফীহা মিসবা । আল্লাহই হলেন এ পৃথিবীর এবং আকাশের নূর আর তাঁর নূরের উপমা হলো হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, (২৪ঃ ৩৬) আমরা যদি একটি প্রশ্ন তৈরী করি যে বিরুদ্ধবাদীদের উপর আল্লাহ্তাআলা জয়যুক্ত হয়েছেন এর প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত কি? তাহলে এর উত্তর স্পষ্ট জগতের সামনে, পূর্ববর্তী নবীদের কুরবানীর মানকে আল্লাহ্তাআলা দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা রেখে তার এক মহাসফলতা হিসেবে মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে তাঁর উপমাস্বরূপ পৃথিবীতে তুলে ধরেছেন। তাঁর মাধ্যমে ইসলামকে আল্লাহ্তাআলা মানবজাতির জন্য একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে দিয়ে দিয়েছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তাআলা বলেন, আল ইয়ওমা আকমালতুলাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নিয়ামাতি ওয়া রাযিতুলাকুমুল ইসলামা দীনা অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দিনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে (অনুগ্রহ)কে সম্পন্ন করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীনরূপে মনোনীত করলাম। (৫ঃ ৪) এ আয়াতে বলা হয়েছে খোদাকে লাভ করতে হলে মানুষের দৈহিক ও বাহ্যিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সকল আদেশ নিষেধ এবং মানুষের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ও আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সব আদেশ নিষেধকে তুলে ধরেছেন। সুতরাং আমরা যদি গভীরভাবে ধর্মের ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখি এর পেছনে এক মহা কুরবনী নিহিত রয়েছে। যে কুরবানীর ফলশ্রুতিতে আরবে বিশেষ করে মক্কাতে ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তাআলা বলেন, ওয়া ইয ইয়ারফাউ ইব্রাহিমুল ক্বাওয়ায়েদা মিনালবাইতে ওয়া ইসমাঈল রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্তাস সামিয়ুল আলীম, অর্থাৎ এবং (স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল এই গৃহের ভিত্তি উঠাইতেছিল, (এবং দোয়া করিতেছিল) হে আমাদের প্রভু! আমাদের নিকট হতে (এই সেবা) নিশ্চয় তুমিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী। (২ঃ ১২৮)

[চলবে]

–হাসেম উল্লাহ্ সিকদার

মুলাকাৎ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) এর সাথে প্রশ্নউত্তর অধিবেশন

বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাথে হুযূর রাবে' (রাহেঃ)-এর সাক্ষাৎকার (১৯-০২-০২ তারিখে এম, টি,এ'র মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত)

প্রশ্ন নং ১ ঃ চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর যদি কোন ব্যক্তি তার প্রাপ্ত টাকা-পয়সা বিনিয়োগ না করে ব্যাংকে Fixed Deposit হিসেবে জমা রাখে তো এটা কী ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ হবে? কেননা বিনিয়োগে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ যদি সরকারী ব্যাংকে বা সরকার দ্বারা পরিচালিত স্কীমে টাকা-পয়সা Deposit রাখা হয় তো বৈধ হবে। কিন্তু বেসরকারী পর্যায়ে বা প্রাইভেট বাণিজ্যিক ধরণের স্কীমগুলোতে Fixed Deposit রাখা ঠিক হবে না।

প্রশ্ন নং ২ঃ এ পৃথিবীতে আমরা নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ আপদে পতিত হই এ কি আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির ফলশ্রুতি, নাকি এগুলি প্রকৃতিক সাধারণ ঘটনা মাত্র?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ আল্লাহ্‌তাআলা বিনা কারণে কাউকে কষ্ট দেন না, আবার ছোট ছোট দোষের জন্যও সব সময় শাস্তি দেন না। আসল কথা হচ্ছে আল্লাহ্‌তাআলা প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর একটা ব্যবস্থা রেখেছেন তারই অধীনে মানুষের কৃতকর্মের ফল প্রকাশিত হয়। এ জায়গায় হুযূর একটা মজার গল্প বলেন ঃ একটা দুষ্ট লোক এক খৃষ্টান পাদ্রীকে প্রায়ই বলতো যে, ধর্ম বলতে কিছুই নেই; ওসব বাজে কথা। আমার মত নাস্তিক হয়ে যাও। পাদ্রী সাহেব খুব বিরক্ত হতেন এবং একদিন ঐ নাস্তিক ব্যক্তিকে কঠোর ভাষায় সাবধান করে দিলেন যে, তোমার উপর আল্লাহ্‌তাআলার শাস্তি আপতিত হবে। সেই পাদ্রী সাহেব যেমনই এ কথা বললেন, ঠিক তখনই বজ্রপাত হল; কিন্তু তা গিয়ে পড়লো গির্জা ঘরের উপর। সঙ্গে সঙ্গে নাস্তিক ব্যক্তি পাদ্রী সাহেবকে প্রশ্ন করলো, বলুন, এতে কী প্রমাণিত হল? তখন পাদ্রী সাহেব বললেন, আসলে আল্লাহ্‌তাআলা তোমাকেই শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু নিশানা ঠিক করতে সামন্য একটু ভুল হয়ে গিয়েছে!"

প্রশ্ন নং ৩ ঃ মাঝে মাঝে এমন ঘটনা ঘটে যে, পিতামাতার অজ্ঞাতে এক আহমদী যুবক কোন অ-আহমদী যুবতীকে কোর্টে গিয়ে বিয়ে করে এবং পরে জামাতের আমীর বা প্রেসিডেন্টকে ধরে যে, এবার মসজিদে বিয়ে পড়িয়ে দিন। এই ধরনের পরিস্থিতিতে হুযূরের পরামর্শ কী?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এটা একেবারেই ঠিক নয়। এ পদ্ধতিকে মোটেই প্রশ্রয় দিবেন না। একবার যে কোন কোর্টে গিয়ে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করে তার মসজিদে এসে বিয়ে

পড়ানোর কী দরকার। আমীর বা প্রেসিডেন্ট তার কথা গ্রহণ করবেনই কেন? যদি আমীর বা প্রেসিডেন্টের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকতো তাহলে তো তার আগেই তাঁদের নিকট আসা উচিত ছিলো।

প্রশ্ন নং ৪ ঃ আমরা আহমদীরা বলে থাকি যে, যারা মিথ্যা নবী দাবীকারক ছিলো তাদের বিরুদ্ধে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর যুদ্ধ দাবীর কারণে নয় বরং দেশদ্রোহিতার কারণে। আমাদের এ কথার পক্ষে প্রমাণ কি?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গীতে কথা বলি নবী করীম (সঃ)-এর জীবনীতে তার প্রমাণ রয়েছে। মুসায়লামা কাজ্জাব সহ অনেক মহানবী (সঃ)-এর জীবদ্দশায় নবী হওয়ার মিথ্যাদাবী উত্থাপন করেছিল; কিন্তু মহানবী (সঃ) মুসায়লামাকে খুন করার হুকুম দেননি। পরে হযরত আবূ বকর (রাঃ) যখন খলীফা হলেন তখনও মিথ্যা নবী হওয়ার দাবী আরও কেউ কেউ করেছিল এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে কারও কারও শাস্তি ও হয়েছিল, কিন্তু হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও ঐসব মিথ্যা নবী হওয়ার দাবীকারকগণকে এ কারণে শাস্তি দেননি যে, তারা নবী হওয়ার মিথ্যা দাবী করেছিল! রাষ্ট্রদ্রোহিতার কারণেই হযরত আবূবকর (রাঃ) মিথ্যা দাবীকারকদের শাস্তি দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন নং ৫ ঃ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ সম্প্রতি তাঁর এক ভাষণে বলেছেন, আজকে বিশ্বে মুসলমানদের অবস্থা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অন্যান্য জাতির তুলনায় সব চাইতে পেছনে। হুযূর এ ব্যাপারে কি বলেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের ভিত্তিতে একথা ঠিকই বলেছেন। পৃথিবীতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রজেক্ট চালু আছে ঐসব একমাত্র গ্রেট বৃটেন বা ইউ,কেতে যত বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রজেক্ট আছে সংখ্যায় তার সমানও হবে না আমেরিকার কথা তো দূরে থাক।

প্রশ্ন নং ৬ ঃ আফ্রিকা মহাদেশের জিমবাবুয়ের নামক দেশের রাষ্ট্রপতি জনাব রবার্ট মুগাবে তাঁর দেশে কিছু কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন যেগুলো ইউরোপ আমেরিকা পসন্দ করেনি, যেমন পশ্চিমা সাংবাদিকদের দেশ থেকে বের করে দিয়েছেন। ঐ দেশে পর্যবেক্ষক প্রেরণ করতে পশ্চিমা দেশসমূহ আগ্রহ প্রকাশ করছে। হুযূর এ প্রসঙ্গে কি মনে করেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ জিমবাবুয়ের প্রেসিডেন্ট যে অবস্থান নিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে তাঁর বিরুদ্ধে এবং তাঁর দেশের বিরুদ্ধে যাবে। পশ্চিমা পর্যবেক্ষকগণ নিরপেক্ষ নির্বাচন দেখতে চান। কোন হস্তক্ষেপ যেন না হয়। এর ফলে তাঁর দেশে অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা যাবে।

তৃতীয় বিশ্ব পাশ্চাত্যের অর্থ সাহায্যের ওপরে পুরোপুরি নির্ভশীল তাই পশ্চিমা পর্যবেক্ষকগণ তৃতীয় বিশ্বের আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। পর্যবেক্ষক দল পাঠানোকে তৃতীয় বিশ্ব কোনভাবে এড়াতে পারবে না। কোন দেশ যদি এ ব্যাপারে বিদ্রোহ করে বসে তাহলে তারা লাভবান হবে না এর ফলাফল তাদের বিপক্ষে যাবে। সুতরাং আগে বা পরে তাদের তা গ্রহণ করতেই হবে।

প্রশ্ন নং ৭ঃ বর্তমানে হজ্জ পালন সংক্রান্ত যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে সেটাকে আরও কিভাবে ভাল করা সম্ভব?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ হজ্জ সম্বন্ধে বর্তমান পদ্ধতিকে উন্নততর করা আপাততঃ মোটেই সম্ভব নয়। সাউদী আরব একটি স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রপদ্ধতির অধীনে চলছে। তারা বাইরে থেকে কারও কোন প্রস্তাব গ্রহণ করবে না। বাইর থেকে এ ব্যাপারে কোন কিছু করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন নং ৮ ঃ পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে বলা হয় যে, মুসলিম দেশগুলোতে মহিলা ও শিশুদের উপর জুলুম করা হয়। অর্থাৎ শিশুদের আদর যত্ন কম হয়। হুযূর এ ব্যাপারে কি মনে করেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ আসলে সমাজ ব্যবস্থা সঠিক জানা না থাকার কারণে বলা হয় যে, মুসলিম দেশগুলোতে নারী ও শিশুদের উপরে জুলুম করা হয়। আমার মনে হয় আমেরিকাতে বা পাশ্চাত্যে বড়রা মদ্য পান করে বলে তারাই নেশা গ্রস্ত হয়ে নারী ও শিশুদের ওপরে তুলনামুলকভাবে বেশি জুলুম করে। কোন কোন সময় দেয়ালের সাথে পিটিয়ে মহিলা বা শিশুকে হত্যা করা হয়। যে ব্যক্তি এসব জানে না সে হয়ত এ মন্তব্যকে সঠিক বলে মনে করবে। এ কথা ঠিক যে, তৃতীয় বিশ্বের কোন কোন দেশে মহিলা ও শিশুদের ওপরে নির্যাতন করা হয় তবে আমেরিকাতে যা হচ্ছে তার সাথে এর কোন তুলনাই নেই। ইংল্যান্ডে ও এ রকম নির্যাতন চলছে। পত্র-পত্রিকায় এসব বস্তুনিষ্ঠ খবরও প্রকাশিত হচ্ছে। বিশেষ করে দরিদ্র ও শ্রমিক শ্রেণীর লোকদের ওপর এ ধরনের নির্যাতন বেশি বেশি হয়।

প্রশ্ন নং ৯ ঃ কমনওয়েলথ (Commonwealth) এর মত সংগঠনের কোন কার্যকারিতা আছে কিনা।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ কমনওয়েলথের যারা সদস্য তারা অনেক লাভবান হয়। কমনওয়েলথের সদস্য দেশের নাগরিকরা সহজে এদেশে প্রবেশ করতে পারে। যারা এর সদস্য নয় সেসব দেশের লোকেরা সহজে এখানে আসতে পারে না। এর অনেক উপকারিতা আছে। যেসব দেশ কমনওয়েলথের সদস্য তারা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়। বিভিন্ন পরিকল্পনার অধীনে কমনওয়েলথ থেকে সেসব দেশকে সাহায্য করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন নং ১০ ঃ হুযূর কোন্ অবস্থা আপনাকে রাগান্বিত করে?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ যদি কেউ বিনা কারণে গোলমাল করে বা চিৎকার করে তাতে আমি রাগ করি। আমি পৃথিবীতে যখন কোন অন্যায়-অত্যাচার দেখি তা আমার রাগের কারণ হয়। মানুষের দুঃখ দেখে আমি দুঃখ পেয়ে থাকি।

প্রশ্ন নং ১১ ঃ যখন হযরত ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশে ঝুলানো হয়েছিল তখন তাঁর বয়স কত হয়েছিল?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করা হয়েছে। কেউ বলে, তখন হযরত ঈসা (আঃ)-এর বয়স ৩৩ [তেত্রিশ] বছর ছিল। কেউ কেউ বলেন, তখন তাঁর বয়স ৪০ বছর ছিল। যেহেতু হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে আর এ পার্থক্য ৪-৭ বছর। সুতরাং এ ৩৩-এর সাথে যদি আপনি ৭ বছর যোগ করেন তাহলে ৪০ বছর দাঁড়ায়। মুসলমানরা বলেন,

তখন তাঁর বয়স ৪০ চল্লিসের বেশি ছিল। আপনারা জানেন যে, ৪০ বৎসর বয়সের পরেই আল্লাহ্‌তাআলা কাউকে নবীর মর্যাদা দিয়ে থাকেন।

প্রশ্ন নং ১২ ঃ হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্রুশের ঘটনার মত নবী করীম (সঃ)-কে কি কোন ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর যে ত্যাগ ও কুরবানী তাঁর সাথে হযরত ঈসা (আঃ) ক্রুশ বিদ্ধ হওয়ার কোন তুলনা হয় না। ক্রুশীয় ঘটনাকে একটি গল্পে সাজানো হয়েছে। যেদিন হযরত ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশে দেয়ার কথা ছিলো তার আগের রাত্রে তিনি বার বার এ মৃত্যুর পেয়ালা তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে নিতে বলেছিলেন। আর তিনি সারারাত দোয়া করে কাটিয়েছিলেন–এলি এলি লেমা সাবাক্তানী–প্রভুহে, প্রভুহে, তুমি কি আমাকে ভুলে গেলে? এথেকে বুঝা যায়, ঈসা (আঃ) কখনও স্বেচ্ছায় ক্রুশীয় মৃত্যু কামনা করেননি। তাই ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু সম্বন্ধে মানুষের ধারণাকে প্রথমে সংশোধন করতে হবে। এর সাথে হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর যতটুকু সম্পর্ক আছে, তাঁর বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি তো সব রকমের ত্যাগের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর নামায কুরবানী তাঁর জীবন ও মরণ সবই ছিল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। তিনি যেসব যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন তাতে তিনি বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি (সঃ) যুদ্ধের কেন্দ্রস্থলে থাকতেন। হুনায়েনের যুদ্ধে তিনি (সঃ) মাঠে একা ছিলেন তখনও তিনি পিছু হটেননি। তিনি (সঃ) সাহসের সাথে উচ্চারণ করেছিলেন–আমি মিথ্যা নবী নই, আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান। এভাবে তিনি যুদ্ধের মাঠে বীরত্বের সাথে মোকাবেলা করেছেন যা ঈসা (আঃ) কখনও করেননি।

প্রশ্ন নং ১৩ ঃ খুব শীঘ্র ইউরোপের সব দেশে একটি নতুন মুদ্রা EURO চালু হয়ে যাবে। এর ফলে বিশ্ব অর্থনীতির উপর কি প্রভাব পড়তে পারে?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ বিশ্ব অর্থনীতির উপর ইউরো (EURO) মুদ্রার প্রবর্তনের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়বে না। প্রত্যেক দেশে নিজ নিজ মুদ্রা রয়েছে। EURO-এর প্রভাব কেবল ইউরোপীও দেশের অর্থনীতিতে পড়তে পারে।

প্রশ্ন নং ১৪ ঃ পশু কুরবানীর সময় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ধনীরা যতটুকু ফরয তার চেয়েও বেশি পরিমাণে পশু-কুরবানী দিয়ে থাকেন এটা কি ঠিক?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এটি নিঃসন্দেহে পসন্দনীয় প্রবণতা। পশু কুরবানীর মাংস তো ধনী লোকেরা গরীব ভাই-বোনদেরকেই দিয়ে থাকেন। অনেক গরীব পরিবার এতই অভাবী হয় যে, তারা মাংস কিনে খেতে পারে না শাকসবজী ও ডাল খেয়ে থাকে। তাই ধনীরা যখন তাদের ওয়াজিব কুরবানীর পরও অতিরিক্ত কুরবানী করে আর সেই কুরবানীর মাংস গরীবদের পাঠায় তখন গরীবরা পুষ্টিকর খাবার খেতে পারে।

প্রশ্ন নং ১৫ ঃ খৃষ্টানরা যে FATHTER'S DAY এবং MOTHER'S DAY পালন করে, তা ইসলামে আছে কি?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ খৃষ্টানরা ভাল কাজই করছে; কিন্তু এর মধ্যে আনুষ্ঠানিকতাই বেশি। মুসলমান ঘরে তো প্রত্যেক দিনই এ দিন পালন করা উচিত। মা বাবার সম্মান বছরে একদিন বা দুই দিনে সীমিত থাকা উচিত নয়। মুসলমানদের হুকুম দেয়া হয়েছে, তোমরা সব সময় মা-বাবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। সন্তানদের মনে মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সব সময়ই থাকা উচিত।

প্রশ্ন নং ১৬ ঃ ফিরিশ্‌তাগণেরও কি মৃত্যু হয়?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ না ফিরিশ্‌তারা মরে না তাদের কাজ হ'ল মৃত্যুদান করা।

প্রশ্ন নং ১৭ ঃ কুরআন করীমের ২১ঃ৩১ ও ২৪ঃ৪৬ আয়াত মোতাবেক প্রত্যেক প্রাণীকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। ডারউইন তত্ত্বের সাথে এর কোন সম্পর্ক আছে বা তিনি কি এ তত্ত্ব কুরআন থেকে নিয়েছেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ না, ডারউইন যদি কুরআন থেকে এ ধারণা নিতেন তাহলে সৃষ্টি সম্বন্ধে কুরআন যে কথা বলে তার সবই তাঁর নেয়া উচিত ছিলো। তিনি সব কথা গ্রহণ করেননি। মানুষের সৃষ্টি ও বিবর্তন সম্বন্ধে কুরআন শরীফ বলেছে, মানুষকে এমন মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে যা থেকে শব্দ বের হয়। পৃথিবীর অন্য কোন পুস্তক সৃষ্টি সম্বন্ধে এ কথা উল্লেখ করেনি। এটি অসাধারণ একটি বিষয়। ডারউইন যদিও পানি থেকে মানুষ বা জীবের সৃষ্টি হযেছে বলে স্বীকার করেছেন। রসায়ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। আবার রসায়ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়। এভাবে সৃষ্টি হওয়াটা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়া সত্ত্বেও এটি একটি আশ্চর্যজনক দিক।

প্রশ্ন নং ১৮ ঃ আহমদীরা কি FRANCHISE ব্যবসায় যেমন MACDONALD ইত্যাদি টাকা খাটাতে পারেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ যদি হালাল খাবারের ব্যবসায় হয় তো কোন অসুবিধা নেই। যেখানে অবৈধ খাবারের ব্যবসায়ের বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে আহমদীদের বিনিয়োগ করা উচিত নয়।

প্রশ্ন নং ১৯ ঃ সূরাতুল হাক্কাতে আছে ইন্নাহুক্বওলুন রসূলুন কারীম। আমার প্রশ্ন আল্লাহ্‌তাআলা রসূলুন কারীম কেন বলেছেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ রসূল শব্দের অর্থ হচ্ছে দূত বা বার্তাবাহক এবং কারীম শব্দের অর্থ হচ্ছে সম্মানিত। আল্লাহ্‌তাআলা বুঝাতে চেয়েছেন যে, মহানবী (সঃ) আল্লাহ প্রেরিত এক সম্মানিত দূত ছিলেন। এটা এমনই একটি বাক্য যেভাবে হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-ও এক জায়গায় লিখেছেন "এসব কথা আমার মুখ থেকে বের হচ্ছে কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে এসব বাক্য উচ্চারিত হচ্ছে (আমার ইচ্ছায় নয়)।"

প্রশ্ন নং ২০ ঃ বাংলাদেশ থেকে একজন এ প্রস্তাব করেছেন যে, হুযূর যেহেতু 'ওলাদদোয়াল্লীন' ও 'মাগদুব' পাঠ করেন তখন সবারই এভাবে উচ্চারণ করা উচিত। হুযূর এ প্রসঙ্গে কী বলেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এটি প্রত্যেক ব্যক্তির দক্ষতা ও যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে যে সে কতটা সঠিক উচ্চারণ করতে পারে। 'যোয়াদ' এর উচ্চারণের বিষয়টি একটু কঠিন। এটা দোয়াল্লীনও নয় আর যোয়াল্লীনও নয়। এর মাঝামাঝি উচ্চারণ। যারা কুরআনে মজীদ যত্ন করে পড়েন তারা নিশ্চয়ই খুব সাবধান থাকবেন। প্রত্যেক ইমাম সাহেব নিজের যোগ্যতা অনুসারে সযত্নে সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন।

অনুবাদ ও সংকলন– **নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী**

বগুড়া জামাতে ডিশ এন্টিনায় আন্ত র্জাতিক সালানা জলসা প্রদর্শন

কেন্দ্রীয় জামাত কর্তৃক প্রচারিত অনষ্ঠান সূচী মোতাবেক বগুড়া জামাতের ডিশ এন্টিনায় ২০০৬ সনের লন্ডন জলসা এম.টি.এ. চ্যানেলের মাধ্যমে প্রদর্শন বিষয়ক এক সফল অনুষ্ঠান বাস্তবায়নের জন্য অধিকাংশ সদস্যগণের বাড়ী বাড়ী দাওয়াত ও প্রোগ্রাম পৌছানো, যেরে তবলীগ আনয়ন, নওমোবাঈনদের উপস্থিতি নিশ্চিত করনের মাধ্যমে ২৮.০৭.২০০৬ তারিখ শুক্রবার বিকাল ৫:৩০ মিঃ হতে ৩০.০৭.২০০৬ তারিখ রাত ১:০০ টা পর্যন্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এম.টি.এ. চ্যানেল প্রদর্শন বিষয়ক অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে তালিম-তরবিয়তী ক্লাসের ব্যবস্থা করা গ্রহণ করা হয়, যাতে বিভিন্ন শিক্ষক/বক্তা জলসায় যোগদানের বরকত, সাদাকাতে মসীহ মাওউদ (আঃ), কুরআন শিক্ষা, অর্থসহ নামাজ শিক্ষা, খেলাফতের গুরুত্ব ও আনুগত্য, মালী কুরবানীর বরকত ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য/ক্লাস পরিচালনা করেন। স্থানীয় জামাতের সেক্রেটারী যিয়াফত জনাব আশরাফ হোসেন (হিরুর) নেতৃত্বে একটি আপ্যায়ণ কমিটি গঠন করা হয়েছিল, যাঁরা আগত মেহমান, যেরে তবলীগ ও নওমোবাঈনদের থাক-খাবার ব্যবস্থা করেছেন। ৩ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের প্রদিদিনের গড় উপস্থিত ৪০ জন। এদের মধ্যে ১৩ জন সিরাজগঞ্জের নওমোবাঈন সদস্য এক নাগাড়ে ৩ দিন অবস্থান করেছেন। প্রতিদিন প্রায় ৬ জন করে যেরে তবলীগ অনুষ্ঠান দেখেছেন এবং ১ জন বয়আত গ্রহণ করেছেন।

মাহান আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের হাফেয নাসের ও হাদী হউন, আমীন।

খন্দকার আজমল হক

প্রেসিডেন্ট

আঃ মুঃজাঃ বগুড়া

সীরাতুন্নবী (সঃ) জলসা উদযাপন

গত ৩০/০৪/০৬ ইং তাং আহমদীয়া মুসলিম জামাত তারুয়ার উদ্যোগে মহান সীরাতুন্নবী (সঃ)এর জলসার প্রোগ্রাম হাতে নেয়া হয়। উক্ত সীরাতুন্নবী (সঃ) জলসাগুলোতে মহানবী (সঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রতিটি সভায় ননআহমদী ভাই উপস্থিত ছিলেন। প্রতিটি সভায় উপস্থিত ছিল উর্ধে ৩০০ শত জন নিম্নে ৫০ জন। উক্ত জলসাগুলোতে যে সমস্ত বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা হয়েছে তার বরকত ও কল্যাণ তারুয়া জামাত যেন ধারাবাহিকভাবে পেতে থাকে। সেজন্য সবার কাছে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

জহির আহমদ মিয়াজী

আঃমুঃজা তারুয়া বি-বাড়ীয়া

সিরাতুন্নবী (সঃ) দিবস পালন

গত ২২/০৭/২০০৬ইং চান্দপুর চা বাগান জামাতের উদ্যোগে জানাব আব্দুল কাদির চৌধুরীর সভাপতিত্বে চন্ডিছড়া চাবাগানে বাদ জুমুআ সীরাতুন্নবী (সঃ) দিবস উদযাপন করা হয়। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া এই ইজতেমার উদ্যোগে গত ১০/০৩/২০০৬ইং মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) দিবস, ১৪/০৪/২০০৬ইং মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দিবস, ২৩/০৬/২০০৬ইং খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। মহান আল্লাহ্ আমাদের নেক কাজ কবুল করুন আমীন।

আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (প্রেসিডেন্ট)

আঃ মুঃ জাঃ চানপুর চাবাগান

খেলাফত দিবস উদযাপন

গত ২৭/০৫/২০০৬ইং আহমদীয়া মুসলিম জামাত তারুয়ায় মসজিদে বাশারতে মাগরিবের নামাযের পর মহান খেলাফত দিবস স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব জহির আহমদ মিয়াজির সভাপতিত্বে আরম্ভ হয়। উক্ত দিবসে উপস্থিত ছিল ১০৫ জন। তারুয়া বাজারের ৬৫টি নন আহমদী দোকানে দোকানে খেলাফত দিবসের বার্তা ও মিষ্টির পেকেট বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের মাঝে ও বাড়িতে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। পরিশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

জহির আহমদ মিয়াজী

(প্রেসিডেন্ট)

আঃ মুঃ জাঃ তারুয়া বি-বাড়িয়া

জেলা মজলিসের তালিমুল কুরআন ক্লাশ ও ৩য় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

০৩/৬/০৬-০৫/০৭/০৬ পর্যন্ত প্রথম তালিমুল কুরআন ক্লাস এবং ০৬/০৭/০৬ এবং ০৭/০৭/০৬ দুদিন ব্যাপী ৩য় বার্ষিক জেলা ইজতেমা নিউসোনাতোলা মজলিসে প্রফেসার রাজিবউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এতে ১১জন আনাসর নিয়মিত ক্লাস করেন এবং ৫ জন প্রাথমিকভাবে কুরআন নাযেরা শিক্ষা লাভ করেন। এছাড়া প্রতিদিন নাসেরাত, খোদ্দাম ও আতফাল কুরআন ক্লাস করে।

সমাপনী ভাষণ, আহাদনামা পাঠও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

মহান আল্লাহতাআলা আমাদের সকলের হাফেজ, নাসের ও হাদী হউন, আমীন।

জেলা নাযেম,

মজলিসে আনসারুল্লাহ্

বগুড়া-সিরাজগঞ্জ জেলা মজলিস

৪র্থ জেলা তালিম তরবীয়তী ক্লাস ও ইজতেমা সম্পন্ন

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, জাঁকজমকপূর্ণভাবে নিরিবিলি পরি.বশে মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয় বৃহত্তর দিনাজপুর-পঞ্চগড় ৪র্থ জেলা তালিম

তরবীয়তী ক্লাস ও ইজতেমা ০৬ গত ২৭শে মে ডোহান্ডা মজলিসে সাফল্যের সাথে বাদ মাগরিব কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি মোহতর মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম স্বপন সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে উক্ত তরবিয়তী ক্লাসে এবং ইজতেমায় ৮টি মজলিস অংশগ্রহণ করেন। সবার কাছে দোয়ার আবেদ রইল। দোয়ার আবেদন করছেন জেলা তালিম তরবিয়তী ক্লাস ও ইজতেমার কমিটির চেয়ারম্যান, বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা।

মোঃ আঃ রউফ

মজলিসে আনসারুল্লাহ্ ঘাটুরা ১২তম স্থানীয় ইজতেমা সম্পন্ন

গত ১৭ই আগষ্ট রোজ বৃহস্পতিবার বাদ মাগরীব সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব সালাউদ্দিন সাহেবের সভাপতিত্বে মজলিসে আনসারুল্লাহ্ ঘাটুরা ১২তম স্থানীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এবং বিকাল ৫টায় সমাপ্তি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শেষ হয়। বাংলাদেশের সকল আহমদী ভাই বোনদের নিকট আঃমুঃজাঃ ঘাটুরার সার্বিক উন্নতির জন্য দোয়ার আবেদন করছি।

খলিলুর রহমান লস্কর,
যয়ীম
মজলিসে আনসারুল্লাহ্, ঘাটুরা

খুলনায় লাজনা ইমাইল্লাহ্র সেমিনার

গত ১১-০৮-০৬ তরিখ্ শুক্রবার বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে মোহতরমা দীনা নাসরিন প্রেসিডেন্ট লাঃ ইঃ খুঃ এর সভাপতিত্বে মহানবী (সঃ)-এর জীবনীর উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তেরাওয়াত, নযম ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। ১। এতে মহানবী (সঃ)এর শিক্ষা জীবন, ২ ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্মীয় স্থানগুলোর পবিত্রতা রক্ষা, ৩। ইসলাম ও সমঅধিকার, ৪। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর অধিকার ও সম্মান। বিষয়ের উপরে বক্তারা আলোকপাত করেন।

সবশেষে খুলনা জামাতের আমীর সাহেবের দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

কোরায়েশা মাজেদ
জেঃ সেঃ লাঃ ইঃ খুলনা,

রংপুরে লাজনা ইমাইল্লাহ্র ইজতেমা

আল্লাহ্তাআলার অশেষ ফযলে গত ৭ই আগষ্ট ২০০৬ইং তারিখে রংপুর জামাতের মসজিদে লাজনা ইমাইল্লাহ্ রংপুর-এর ৬ষ্ঠ বার্ষিক ইজতেমা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ। ইজতেমায় উপস্থিত সংখ্যা ছিল ৩০ জন।

আনোয়রা বেগম, প্রেসিডেন্ট
লাজনা ইমাইল্লাহ্, রংপুর

দোয়ার আবেদন

চানপুর চা বাগানের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট বৃহঃ সিলেটের প্রথম দিকের আহমদী। আহমদীয়াতের জন্য অনেক ত্যাগ করেছেন সেবা করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থাবস্থায় ভুগছেন। তাঁর এবং তাঁর পরিবারের প্রতি আল্লাহ্র শান্তি বর্ষণের জন্য দোয়ার আবেদন করছি।

আনোয়ার হোসেন চৌধূরী
চন্ডিছড়া চা বাগান

শুভ বিবাহ

❑ গত ২৫/০২/০৬ তারিখে এস এম, শরিফ উদ্দিন এর কন্যা মোসাম্মাৎ শারমিন আক্তার (রত্না) সাং মীরগাং যতীন্দ্রনগর সাতক্ষীরা এর সাথে জনাব এস, এম, রেজাউল করিম এস, এম আরিফুর রহমান সাং যতীন্দ্রনগর শ্যামনগর সাতক্ষীরা এর বিয়ে ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা মোহরানা ধার্যে সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিঃ নং ৫৪৭/০৬

❑ গত ০৬/০৩/০৬ তারিখে মোহাম্মদ মোস্তফা মিয়া এর কন্যা মোসাম্মাৎ আসমা খানম (শ্যামলী) সাং আম্বর নগর সোনাইমুড়ি নোয়াখালী এর সাথে আব্দুল জলিল এর পুত্র জনাব শামীম আহমদ সাং দক্ষিণ শ্রীপুর, আসুলিয়া ঢাকা এর বিয়ে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা মোহরানা ধার্যে সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিঃ নং ৫৪৮/০৬

❑ গত ২৩/০২/০৬ তারিখ জনাব হাফেজ আহমদ পাটোয়ারী এর কন্যা মোসাম্মাৎ মাহফুজা হাফেজ রোজি সাং চরদুখিয়া, গন্ডামারা চাঁদপুর এর সাথে জনাব ডাঃ গোলাম মোরশেদ এর পুত্র জনাব মোহাম্মদ মোস্তাকিম উত্তর বাহেরচর সাভার, ঢাকা এর বিয়ে ১,০০,০০১ (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানা ধার্যে সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিঃ নং ৫৪৯/০৬

ভুল সংশোধন

১। গত ১৫ আগষ্ট ০৬ পাক্ষিক আহমদীর তয় সংখ্যায় ৪০ পৃষ্ঠায় ২য় কলামে কৃতী ছাত্রী কলামে সাবরিনা চৌধূরী রাকার খালত ভাই আফজালুর রহমান রিপন (সাংবাদিক) সাবেক কায়েদ ক্রোড়া সংবাদের নীচে ভুলক্রমে ছাপা হয়নি।

২। গত১৫ আগষ্ট '০৬ পাক্ষিক আহমদীর ৩য় সংখ্যায় ৪১ পৃষ্ঠায় শোক সংবাদে ক্রোড়া মজলিসের সাবেক কায়েদ সাংবাদিক আফজালুর রহমান রিপনের পিতার মৃত্যু ১১ই আগষ্ট '০৬ ইং এর স্থলে ভুলক্রমে ১১ই অক্টোবর '০৬ ছাপা হয়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক

জলই জীবন / WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয়

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্ব প্রথম ফল পাবেন। (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems) - ১০ দিন। (৩) উচ্চ রক্তচাপ-(Hipertension) ১ -মাস (৪) বহুমূত্র (Diabetes) - ১ মাস (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis) - ৩ মাস। (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases) - ৩ মাস (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland) - ৩ মাস। (৮) কর্কট রোগ (Cancer) প্রথম থেকে রোগ ধরা পড়লে - ৬ মাস। (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ - ১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাত রাস, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমান জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছামত জলপান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ্য চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিঁড়ি রেস্তোরা ১ নীচতলা
রোড নং ৪৫ প্লট ৩২/১,
গুলশান ২, ঢাকা ১২১২।
ফোন ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫১৯২২

ধানসিঁড়ি খাবার
অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন ৯১৩৬৭২২

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে
ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ
সালমান
৩৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.
AIR-RAFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

খেলাফতে আহমদীয়া শত বার্ষিকী জুবিলী ২০০৮ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১। প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২। প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩। সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪। **রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন** [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।
অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫। **রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌'হাব** [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।
অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬। **আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম** [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।
অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭। **আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে**। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।
অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)
অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯। দুরূদ শরীফ (অর্থসহ সালাত বই থেকে) প্রত্যেহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল-এর ৮-১৪ জুলাই ২০০৫ তারিখের সৌজন্যে)

হুযূর (আইঃ)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সেক্রেটারী তরবিয়ত ও তাহরিকে জাদীদ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

New Vol. No. 69 ■ 4th Issue
Fortnightly

31 August, 2006. ■ Tk. 10.00
রেজি ঃ নং-ডি, এ-১২

The AHMADI

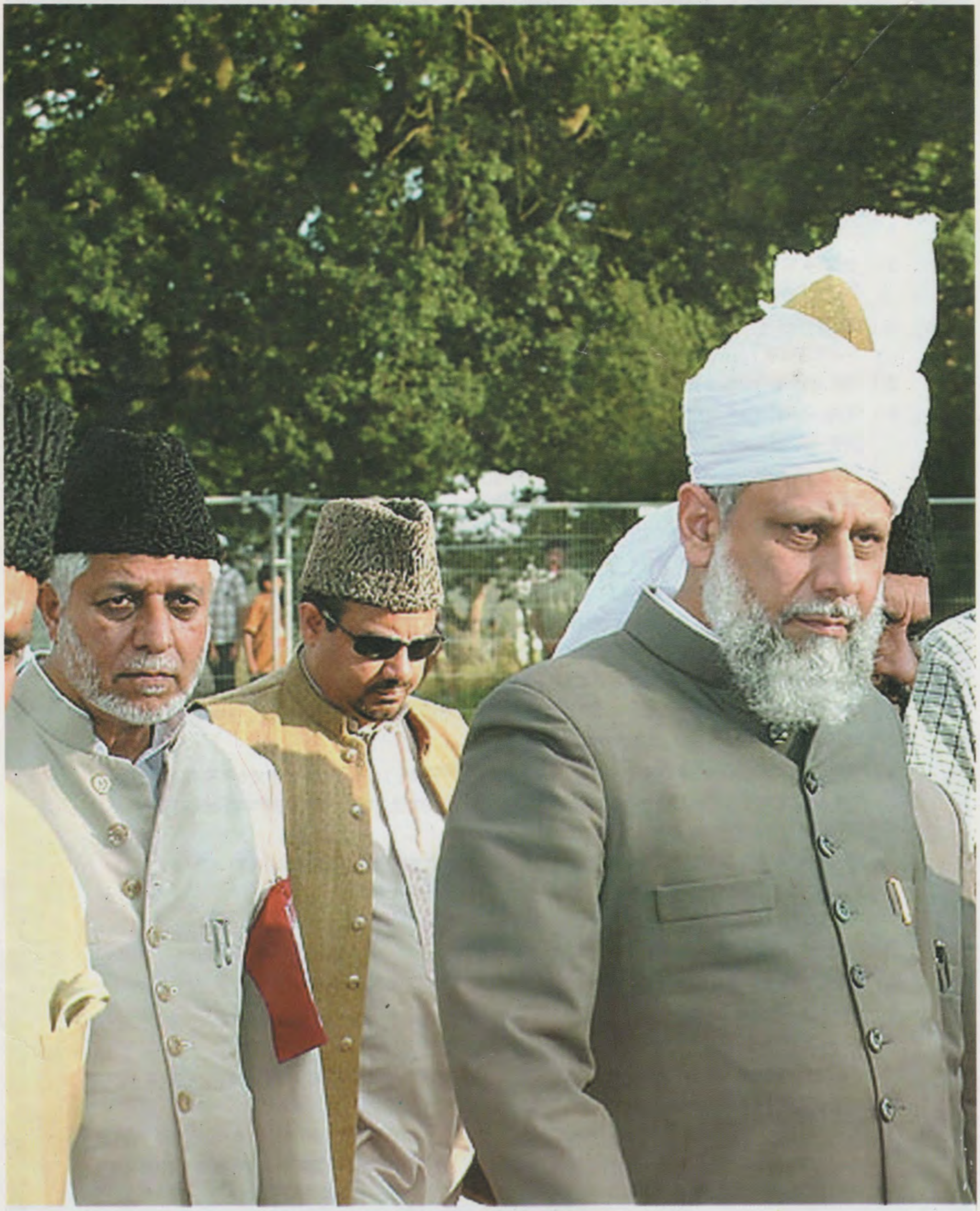

Huzur on the hill top of Hadiqatul Mahdi

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge: Mahbub Hossain, National Secretary Ishaat
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925 E-mail: amgb@bol-online.com